বাংলা ছোটগল্পের উদ্ভব ও বিকাশ ঃ সাধারণ আলোচনা

ভূমিকা

গল্প আর ছোটগল্প এক নয়। গল্প হল বর্ণিত আখ্যান। কিন্তু ছোটগল্পে আখ্যানকে বিশেষ রীতি, শৈলী ও রূপে প্রকাশ করা হয়। সাহিত্য-শিল্পের মধ্যে ছোটগল্প হল সর্বাধুনিক। ছোটগল্পের জন্ম হয়েছে উনিশ শতকে। শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারে এবং প্রযুক্তি ও যন্ত্রের প্রভাবে মানুষের জীবনে এসেছে ব্যস্ততা। আগের মতো বড় বড় সাহিত্য পড়ার সময়ও সংকুচিত হয়েছে। অথচ মানুষ জীবনের কথা জানতে চায়, সাহিত্য পড়তে চায়। আধুনিক মানুষের উপযোগী করে ছোটগল্প-শিল্পের আবির্ভাব হয়েছে। একালের পড়ুয়া মানুষ আবার সংবাদপত্র ও সাময়িকী নির্ভর। তারা ঝটপট খবর জানতে চায়, ঘটনায় মেতে উঠতে চায়। এদিকে তাদের সময়ও কম। তাদের মনমানসিকতার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে পত্রিকা বা সাময়িকীর পৃষ্ঠা ভরাবার জন্য ছোটগল্পের মতো সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত সাহিত্য-আঙ্গিকের জন্ম হয়েছে। আমরা এই পাঠে ছোটগল্পের সংজ্ঞা, জন্মবৃত্তান্ত, ক্রমবিকাশ ও বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাস প্রসঙ্গে একটি ধারণা নেয়ার চেষ্টা করবো।

সাধারণ উদ্দেশ্য

বাংলা ছোটগল্পের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কিত সাধারণ আলোচনাটি পাঠের পর আপনি−

- ছোটগল্প কাকে বলে অর্থাৎ ছোটগল্পের সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।
- ছোটগল্পের জন্মবৃত্তান্ত ও বিকাশ সম্বন্ধে একটি বর্ণনা লিখতে পারবেন।
- বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাস বিষয়ে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে পারবেন।
- বাংলাদেশের ছোটগল্প সম্পর্কে একটি বিবরণ লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

ছোটগল্পের সংজ্ঞা নানাভাবে বোঝানো হয়েছে। ছোটগল্প যে ছোট আকৃতির সাহিত্য রচনা তা নামেই বোঝা যায়। প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, ছোটগল্প প্রথমে গল্প তারপর ছোট। এর আকৃতি কত বড় হতে পারে? এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, পাঁচশ থেকে দুই হাজার শব্দের মধ্যে ছোটগল্প রচিত হওয়া উত্তম। তবে এ নিয়ে একেবারে ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। এক দুই পৃষ্ঠার ছোটগল্পও আছে, আবার ত্রিশ-চল্লিশ পৃষ্ঠার ছোটগল্পও আছে। যেমন, বাংলাসাহিত্যে বনফুলের ছোটগল্পগুলো ছোট-ছোট, ওদিকে রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়', 'অতিথি' ইত্যাদি হল বড় আকৃতির ছোটগল্প।

উপন্যাসের সঙ্গে ছোটগল্পের পার্থক্য আছে। উপন্যাসে থাকে জীবনের বিস্তৃত উপাখ্যান। আর জীবনের দু'একটি তাৎপর্যপূর্ণ অংশকে অবলম্বন করে ছোটগল্প রচিত হয়। উপন্যাস সবকিছু গ্রহণ করে, কিন্তু ছোটগল্প সব বাহুল্য বর্জন করে। ছোট গল্পকে সে-জন্য জীবনের খণ্ডাংশ বা slice of life বলা হয়। ছোটগল্প জীবনের একটা সমস্যার সংকটকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে। সেজন্য ছোটগল্প লেখকের অন্য দিকে দৃষ্টি দেবার অবকাশ নেই। জীবনকে নিয়ে প্রতীতিজাত অনুভূতিই ছোটগল্প রচনার মূল প্রেরণা। এ কারণে ছোটগল্প সবসময় লেখকের ব্যক্তিত্বমণ্ডিত হয়। গীতিকবিতা যেমন কবির ব্যক্তিঅনুভূতির প্রকাশ, ছোটগল্পও অনেকাংশে ছোটগল্পকারের অনুভূতিময় রচনা। বিস্তৃত মানবজীবনকে দেখে বা উপলব্ধি করে লেখক যেসব বিচিত্র অনুভূতি লাভ করেন সেগুলো ছোটগল্পের বিষয় হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পের বিষয় ও রীতি সম্বন্ধে তাঁর 'বর্ষাযাপন' কবিতায় বলেছেন−

“ছোটো প্রাণ, ছোট ব্যথা ছোটো ছোটো দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু-চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব, নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে, সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।”

ছোটগল্প আঁটোসাঁটো রচনা, উপন্যাসের মতো নানা ঘটনা বা কাহিনির বিস্তৃতি ছোটগল্পে থাকে না। ছোটগল্পে চরিত্র সংখ্যা কম। ঘটনা উপস্থাপনায় নাটকীয় কৌশল বা চমক থাকে এবং ছোটগল্পের সমাপ্তিও হয় চমকপূর্ণ। সে জন্য ছোটগল্প পাঠে একটা অতৃপ্তি থাকে, মনে হয় আর কিছু যেন বাকি আছে। ছোটগল্পের কাহিনি দ্রুত পরিণামমুখী হয় এবং ছোটগল্পে থাকে একটিমাত্র বক্তব্য।

ছোটগল্পের সংজ্ঞা

উপরি-উক্ত আলোচনা শেষে এইবার ছোটগল্পের একটি সংজ্ঞা প্রস্তুত করা যেতে পারে–

> ছোটগল্প হল এমন এক সংক্ষিপ্ত গদ্য রচনা যা জীবনের মাত্র দু’একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাকে অবলম্বন করে লেখকের ধারণাগত বক্তব্যকে একমুখী রূপ দান করে।

ছোটগল্প সম্পর্কে নিম্নোক্ত কথাগুলো মনে রাখা দরকার–

১. গল্প আর ছোটগল্প এক নয়।
২. ছোটগল্প আধুনিক কালের সাহিত্যশিল্প।
৩. ছোটগল্প গদ্যে রচিত হয়।
৪. ছোটগল্পের আকার-আকৃতি ক্ষুদ্র। উপন্যাস থেকে ছোটগল্প পৃথক।
৫. ছোটগল্পের বিষয়বস্তু জীবনের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র নানা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কোনো বিশেষ অনুভূতি কিংবা উপলব্ধি।
৬. মানবজীবন সম্পর্কে কোনো বিশেষ প্রতীতি (Impression) ছোটগল্প রচনায় প্রেরণা হিসেবে কাজ করে।
৭. জীবনের কোনো বিশেষ সমস্যার সংকটই ছোটগল্পের উপজীব্য।
৮. ছোটগল্পে একটি মাত্র বক্তব্য থাকে।
৯. ছোটগল্প বাহুল্য বর্জন করে, আর দ্রুত পরিণামের দিকে এগিয়ে যায়।
১০. ছোটগল্পের উপস্থাপনা আকস্মিক ও নাটকীয় হয় এবং পরিসমাপ্তিতেও এই আকস্মিকতা ও নাটকীয়তা থাকে।
১১. ছোটগল্পের চরিত্রসংখ্যা কম।
১২. ছোটগল্প আঁটোসাঁটো রচনা। ছোটগল্পের বর্ণনা ও ভাষার মধ্যে সংযম ও সংক্ষিপ্তি থাকবে।
১৩. ছোটগল্পের উপস্থাপনা ও পরিসমাপ্তি দুই-ই চমকপূর্ণ।
১৪. ছোটগল্প লেখকের ব্যক্তিত্বমণ্ডিত রচনা।

ছোটগল্পের জন্মবৃত্তান্ত ও বিকাশ

গল্প বলা আর গল্প শোনার ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। মানুষ যখন থেকে সভ্য হয়েছে, যখন থেকে চিন্তা ও কল্পনা করতে শিখেছে তখন থেকেই গল্প বলার রীতি শুরু হয়েছে। জনপদের বয়সী বা অভিজ্ঞ মানুষেরাই গল্প বলেন, আর অন্যেরা শোনে। লোকজীবনে দাদি-নানি বা মামি-খালারা গল্প বলে বলে শিশুদের ঘুম পাড়াতেন। বিচিত্র সেসব গল্প। কোনো গল্প রাজপুত্র-রাজকন্যার, কোনো গল্প রাক্ষস-খোক্কসের, দৈত্য-দানবের, কোনো গল্প পক্ষীরাজ ঘোড়ার, কোনো গল্প দুরন্ত অভিযানের। সেসব গল্প শুনে শিশুমন কল্পনার পাখায় ভেসে বেড়ায়। তারও ইচ্ছে ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমির পিঠে চড়ে সে তেপান্তরের মাঠ পার হয়। গল্পের ভুবনে অবশ্য সবাই আছে– শিশু, কিশোর, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ সকলেই। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে গল্পের

রীতিনীতিরও পরিবর্তন হয়েছে, বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেও নানা বৈচিত্র্য যুক্ত হয়েছে। গদ্যভাষার প্রতিষ্ঠা লাভের পরে গল্পের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়েছে।

ছোটগল্পের ইতিহাস সুদীর্ঘ কালের। পৃথিবীর মানবগোষ্ঠী এক সময় একজাতীয় গল্প বলত। কিন্তু সেই মানবগোষ্ঠী যখন পৃথিবীর নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে, তখন এক এক এলাকার পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে গল্পের মধ্যে রূপান্তর সাধিত হয়। আজকের দিনে তুলনামূলক গবেষণায় দেখা গিয়েছে পৃথিবীর নানা জায়গার প্রাচীন গল্পগুলোর মধ্যে মিল আছে। এই মিল দেখা যায় রূপকথায়, উপকথায়, নীতিগল্পে ও লোককাহিনিতে। অর্থাৎ এগুলোই হচ্ছে প্রাচীন গল্প। এগুলোর সঙ্গে আরো ছিল পুরাণ কথা, আখ্যান, আখ্যায়িকা, ধর্মকথা ইত্যাদি।

ভারতে প্রাচীন গল্পগুলোর রূপ দেখা যায় জাতক কাহিনি (বুদ্ধের পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত), পঞ্চতন্ত্র, কথা সরিৎসাগর, বৃহৎকথা, উদয়নকথা, দশকুমার চরিত, হিতোপদেশ ইত্যাদিতে, গ্রিসে গ্রিক উপাখ্যানে বিশেষ করে পুরাণ কাহিনিতে। আরবি ভাষায় রয়েছে আলেফ লায়লার কাহিনি; ফারসিতে পারস্য উপন্যাস ও তুতিনামা অর্থাৎ তোতাকাহিনি। ইউরোপে গল্পের উৎস পাওয়া গেল বাইবেলের নানা ধর্মীয় কাহিনিতে এবং মিথলজিতে। অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে দুটি অসাধারণ গল্প সংকলন রচিত হল ইউরোপে। একটি ইংরেজ লেখক চসারের ‘ক্যান্টারবেরি টেলস্’, অন্যটি ইতালীয় লেখক বোক্কাচিয়োর ‘ডেকামেরন’। এই দুটি গল্পসম্ভার পরবর্তী ইউরোপীয় গল্প ও উপন্যাসের অর্থাৎ কথাসাহিত্যের পথদ্রষ্টা।

অবশ্য ছোটগল্পের প্রকৃত শিল্পরূপের প্রকাশ ঘটে ইউরোপে শিল্প বিপ্লব ও ফরাসি বিপ্লবের পরে। ততদিনে রোমান্স কাহিনি আর অভিযান কাহিনির যুগও অতিক্রান্ত হয়েছে; দেখা দিয়েছে বাস্তব জীবনের আলেখ্য, জীবনের নানা রঙ্গরূপ ও রসের কাহিনি। ফরাসি দেশেই ছোটগল্পের যথার্থ শিল্পরূপের বিকাশ ঘটে। জীবনের ছোট ঘটনাকে কীভাবে মহৎ তাৎপর্য দেওয়া যায় তা দেখালেন হিউনো, বালজাক, মেরিমে, দোদে প্রমুখ শিল্পী। ফরাসি দেশে গী দ্য মোপাসাঁর মতো জগৎবিখ্যাত ছোটগল্পকারের আবির্ভাব ঘটল। অসংখ্য গল্পের রচয়িতা তিনি। ছোটগল্পকে যাঁরা চিরকালীন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন মোপাসা নিঃসন্দেহে তাঁদের একজন। রুশ সাহিত্য মূলত উপন্যাসের জন্য বিখ্যাত হলেও ছোটগল্পেও এ সাহিত্যের অবদান প্রভূত। অনেক প্রতিভাবান ছোটগল্পকার রাশিয়াতেও জন্মেছেন, যেমন– পুশকিন, গোগোল, টলস্টয়, গোর্কি প্রমুখ। তবে সবচাইতে খ্যাতিমান হলেন আন্তন চেখভ, ছোটগল্পের আরেক মহারাজা। সরস ও বুদ্ধিদীপ্ত গল্পের জনক তিনি। রুশ সমাজের রূপকার এই অসাধারণ কথাশিল্পী ছোটগল্পকে অনুপম শিল্পকলায় পরিণত করেছেন। ইংরেজি সাহিত্যে ছোটগল্পে যাঁরা খ্যাতিমান তাঁদের মধ্যে সমারসেট মম, ডি.এইচ. লরেন্স, গ্রাহাম গ্রীন, ক্যাথারিন ম্যান্সফিল্ড উল্লেখযোগ্য। আমেরিকাতেও ছোটগল্পের পরিচর্যা হয়েছে। আমেরিকার গল্পকারদের মধ্যে বিখ্যাত ওয়াশিংটন আর্ভিং, ন্যাথানিয়েল হথর্ন, হেনরি জেমস, এডগার এলান পো, মার্ক লন্ডন, ও হেনরি; জার্মানিতে বিখ্যাত সুডারম্যান আর টমাস ম্যান প্রমুখের নাম স্মরণীয়।

বাংলা সাহিত্যে গদ্য প্রতিষ্ঠার সূত্রে ছোটগল্প শিল্পেরও বিকাশ হয়েছে। তবে উনিশ শতকের একেবারে শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথের হাতেই বাংলা ছোটগল্পের যথার্থ রূপ ফুটে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের পরে অনেক ভালো ও স্বনামখ্যাত শিল্পীদের কল্যাণে বাংলা ছোটগল্পও বিশ্বমান অর্জন করে।

বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাস

বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাস বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গে জড়িত। ছোটগল্পের ভাষার মাধ্যম গদ্য। উনিশ শতকের সূচনালগ্নে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার সূত্রে কিছু পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়েছিল, যেগুলো ছিল আখ্যানমূলক। পরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ‘কথামালা’ ও ‘আখ্যানমঞ্জরী’–জাতীয় ছাত্রপাঠ্য গল্পকাহিনি রচনা করেন। তবে এগুলো মৌলিক রচনা নয়। তা ছাড়া এগুলো ছোটগল্পও নয়। কলিকাতায় তখন যে নাগরিকজীবন গড়ে উঠছিল তার মধ্যে গল্পের উপাদান ছিল বহু। এমনিতে সুখদুঃখপূর্ণ বাঙালিজীবন গল্পবস্তুতে ভরপুর। কিন্তু বাঙালি লেখকেরা ছোটগল্পের শিল্পরীতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথই প্রথম বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের সূত্রপাত করেন। ইতিহাসবিচারে রবীন্দ্রনাথের আগেও দুই একজন গল্পকারের নাম উল্লেখ করা হয়। যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের অনুজ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর ‘মধুমতী’ গল্পটিকে প্রথম বাংলা ছোটগল্প রূপে ধরা হয়। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় বয়সে রবীন্দ্রনাথের বড়, কিন্তু তাঁর গল্পসংকলন ‘ওমর চরিত’ রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের ছোটগল্পগুলোর পরে প্রকাশ পেয়েছিল। রঙ্গব্যঙ্গ ও উদ্ভট কল্পনা ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের বৈশিষ্ট্য।

রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পের রীতিনীতি বুঝে নিয়েছিলেন। উনিশ শতকের শেষ পর্যায়ে তাঁর গল্প প্রকাশ পেতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে যখন শিলাইদহ-শাহজাদপুরে ছিলেন, তখন অনেক গল্প লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের গল্পে বাংলার গ্রামজীবনের ছবি ও প্রকৃতিচিত্র সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। পরে নাগরিক জীবন নিয়ে তিনি সুন্দর সুন্দর গল্প লেখেন। তাঁর গল্পে নরনারীর সম্পর্কের এবং সমাজের নানা সমস্যার পরিচয় আছে। সারাজীবনে রবীন্দ্রনাথ একশটির মতো গল্প লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলোর সংকলনের নাম 'গল্পগুচ্ছ'।

রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা গল্পের বিষয়বস্তুতে ও রূপরীতিতে পরিবর্তন আসে। ভালো ভালো ছোটগল্প-শিল্পীর জন্ম হয় বাংলা সাহিত্যে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, বনফুল, বুদ্ধদেব বসু, সুবোধ ঘোষ, সৈয়দ মুজতবা আলী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল কর প্রমুখ। এঁরা সব উঁচুমানের গল্পলেখক। রবীন্দ্রনাথ ও এঁরা সবাই মিলে বাংলা গল্পকে বিশ্বমানে পৌঁছে দিয়েছেন। মানব জীবনের ছোট ছোট সুখ দুঃখের কথা, সমাজ সংকটের নানা প্রশ্ন, ঘরোয়া জীবন, সংসার চিত্র, আর্থিক জীবন সবই এঁদের গল্পে স্থান পেয়েছে। কেউ কেউ চমৎকার হাস্যরসের গল্প লিখেছেন। ভাষায় ও আঙ্গিকেও নানা বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, রবীন্দ্রনাথের গল্পের তুলনায় পরবর্তীকালের গল্পগুলোতে সমাজ বাস্তবতা বেশি প্রতিফলিত হয়েছে। খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ ও তাদের জীবনের শোষণ-বঞ্চনা ও নিপীড়নের সত্য চিত্রও এ গল্পগুলোতে আছে। তবে বাংলা গল্পে প্রধানত মধ্যবিত্ত জীবনের ছবিই বেশি পাওয়া যায়। গল্পলেখকেরাও প্রধানত মধ্যশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এঁদের সমাজদৃষ্টি এবং বাস্তবতাবোধও প্রখর। এভাবে গত একশ বছর ধরে বাংলা গল্পের বিপুল সমৃদ্ধি ঘটেছে।

বাংলাদেশের ছোটগল্প

রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা ছোটগল্প নানা ধারায় বিকশিত হতে থাকে। এ সময় বাংলা সাহিত্যে গল্পের অঙ্গনে বহু লেখকের আবির্ভাব ঘটে। রবীন্দ্রনাথ ১৯৪১ সনে প্রয়াত হন এবং তাঁর মৃত্যুর ছয় বছর পরে অর্থাৎ ১৯৪৭ এ ভারত বিভক্ত হয়। পাকিস্তানি আমলে বাংলা সাহিত্যের ধারাও দুটো রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বর্তমান বাংলাদেশ 'পূর্ব পাকিস্তান' নামে অভিহিত ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা তখন থেকে সাহিত্য-সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ফলে এখানেও ছোটগল্প লেখকের আবির্ভাব ঘটতে থাকে। এঁদের কেউ কেউ যাঁরা আগে কলকাতায় লিখতেন, তাঁরা ঢাকা চলে আসেন। পাকিস্তান আমলে বাংলা ছোটগল্পের প্রথম পর্যায়ের লেখকদের মধ্যে রয়েছেন আবুল মনসুর আহমদ, আবুল ফজল, মাহবুব উল আলম, আবু জাফর শামসুদ্দীন, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ প্রমুখ। আবুল মনসুর আহমদ 'আয়না' নামের ব্যঙ্গ গল্পগ্রন্থ লিখে খ্যাতিমান হন। এ পর্যায়ে মাহবুব উল আলম, আবুল ফজল, আবু জাফর শামসুদ্দীন জীবনধর্মী গল্প লিখেছেন। সেই সময় তরুণ বয়সী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ গল্প লিখে সুনাম অর্জন করেন। তাঁর গল্পের উপস্থাপনরীতি ও ভাষা বেশ আকর্ষণীয় ও আধুনিক। এঁদের সমকালীন আরো কয়েকজন গল্পলেখক বাংলা গল্পের ধারাকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। এঁরা হলেন শওকত ওসমান, আবু ইসহাক, আবু রুশদ, সরদার জয়েনউদ্‌দীন। এঁরা একাধিক গল্পগ্রন্থের প্রণেতা এবং বাংলাদেশের গল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব।

১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন চেতনা ও জীবনচিন্তার প্রকাশ ঘটায়। গল্পের ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়ে। এই প্রভাবের প্রত্যক্ষ ফল নতুন প্রজন্মের গল্প লেখকদের আবির্ভাব। এঁদের মধ্যে স্বনামধন্য হলেন শামসুদ্দীন আবুল কালাম, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আবদুল গাফফার চৌধুরী, সৈয়দ শামসুল হক, বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, সাইয়িদ আতিকুল্লাহ, জহির রায়হান প্রমুখ। শামসুদ্দীন আবুল কালাম কিছুদিন আগে প্রয়াত হয়েছেন। তিনি গ্রাম বাংলার জীবনের রূপকার। আলাউদ্দিন আল আজাদ বাংলাদেশি ছোটগল্পের ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল নাম। তিনি একদিকে সমাজমনস্ক শ্রেণি সচেতন গল্প লেখক, অন্যদিকে মানুষের মনোলোকের রহস্য সন্ধানী। আবদুল গাফফার চৌধুরী একসময় অনেক গল্প লিখেছেন, এখন তিনি বিদেশে থাকেন এবং গল্প লেখা প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন, তবে রাজনৈতিক কলাম লেখক হিসেবে খ্যাতি পেয়েছেন। জহির রায়হানের গল্পে পূর্ববাংলার সামাজিক বিক্ষোভ ধরা পড়েছে। সদ্য প্রয়াত সৈয়দ শামসুল হক মানবিক ধারার গল্প লেখক। বহু গ্রন্থের প্রণেতা তিনি। বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর ও সাইয়িদ আতিকুল্লাহ বেশি গল্প না লিখলেও এঁরা নাগরিক জীবনের বিচিত্র প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন তাঁদের গল্পে।

ষাটের দশকে বাংলাদেশি গল্পের ধারায় পরিবর্তন আসে। সামাজিক জীবনের ও রাষ্ট্রের সমস্যা ও দ্বন্দ্বের নানা ঘটনা গল্পে ছাপ ফেলে। গল্পের বিষয়বস্তুত ও রীতিতেও নতুনত্ব আসে। এই সময়ের গল্পলেখকেরা চেয়েছেন বাংলা গল্পকে রূপরীতিতে আরো আধুনিক ও আন্তর্জাতিক চেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে। এই অন্যতম সেরা গল্পকারদের মধ্যে রয়েছেন হাসান আজিজুল হক, শওকত আলী ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। এঁরা তিনজনই বিখ্যাত ছোটগল্পকার, তীক্ষ্ণভাবে নাগরিক ও সমাজমনস্ক। এঁদের গল্পের বিষয়পরিচর্যা ও ভাষারীতিতেও ভিন্ন রূপ দেখা গিয়েছে। বহু গল্পগ্রন্থের প্রণেতা আখতারুজ্জামান ইলিয়াস নিঃসন্দেহে একজন উজ্জ্বল ছোটগল্পশিল্পী। ষাটের দশকের অন্যান্য গল্পলেখকের মধ্যে রাহাত খান, জ্যোতি প্রকাশ দত্ত ও আবু বকর সিদ্দিকের নামও উল্লেখ করতে হয়। রাহাত খান মধ্যবিত্ত জীবনের রূপ-রূপান্তরের গল্প লেখেন, আর আবু বকর সিদ্দিকের গল্পে আছে জীবনের সংগ্রামচিত্র। জ্যোতি প্রকাশের গল্পের ভাষাভঙ্গিতে নতুনত্ব রয়েছে। ষাটের দশকের আরো কয়েকজন খ্যাতিমান গল্পলেখক হলেন মুর্তজা বশির, আবদুল মান্নান সৈয়দ ও রশীদ হায়দার।

৫২-র ভাষা আন্দোলন, ৬৬-র ছয় দফা দাবি, ৬৯-র গণ-অভ্যুত্থান, ৭০-র নির্বাচনে বাঙালির নিরঙ্কুশ বিজয়ের পরও ক্ষমতা প্রদানে পাকিস্তানিদের অনীহা প্রকাশ এবং ১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাস মুক্তিযুদ্ধ শেষে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। স্বাধীন বাংলাদেশে বাংলা সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্র আরো প্রশস্ত হয়। গল্পের ভুবনেও আসে নতুন উদ্দীপনা ও নতুন আগ্রহ। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের ছোটগল্পের প্রধান উপজীব্য মুক্তিযুদ্ধ। অনেক সার্থক ছোটগল্পে মুক্তিযুদ্ধের রক্তাক্ত স্মৃতি চিত্রিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ ছাড়াও সামাজিক জীবনের নানা সমস্যা ও দ্বন্দ্ব, আর্থিক টানাপোড়েন, মূল্যবোধের অবক্ষয়, নগরায়ণ, প্রযুক্তির বিকাশ এবং এগুলোর অভিঘাতে জীবনের রূপ-রূপান্তর বাংলাদেশের ছোটগল্পে স্থান পেয়েছে। গল্পের ভাষা ও উপস্থাপন রীতিতেও এসেছে পরিবর্তন। সময়ের অগ্রযাত্রায় পরিবর্তন স্বাভাবিক। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে পুরোনো গল্পকারদের অনেকেই সক্রিয় ছিলেন এবং কেউ কেউ এখনো গল্প লেখেন। শক্তিমান নতুন গল্পকাররাও বাংলাদেশের ছোটগল্পকে সমৃদ্ধ করছেন। নতুন প্রজন্মের গল্পকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন কায়েস আহমদ, মইনুল আহসান সাবের, হরিপদ দত্ত, মঞ্জু সরকার, নাসরিন জাহান, হরিশঙ্কর জলদাস প্রমুখ।

সারসংক্ষেপ

ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। ছোটগল্প প্রথমে গল্প তারপর ছোট। পাঁচশত থেকে দুই হাজার শব্দের মধ্যে ছোটগল্প রচিত হওয়া উত্তম। তবে এক-দুই পৃষ্ঠার ছোটগল্পও আছে, আবার তিরিশ-চল্লিশ পৃষ্ঠার ছোটগল্পও আছে। উপন্যাসের সঙ্গে ছোটগল্পের পার্থক্য হচ্ছে উপন্যাসে থাকে জীবনের বিস্তৃত উপাখ্যান, আর জীবনের একটিমাত্র তাৎপর্যপূর্ণ অংশকে অবলম্বন করে রচিত হয় ছোটগল্প । উপন্যাস সবকিছু গ্রহণ করে, কিন্তু ছোটগল্প সব বাহুল্য বর্জন করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বর্ষাযাপন' কবিতায় ছোটগল্পের বিষয় ও রীতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন। ছোটগল্প হল এমন এক সংক্ষিপ্ত গদ্য রচনা যা জীবনের কোনো একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাকে অবলম্বন করে লেখকের ধারণাগত বক্তব্যকে একমুখী রূপদান করে।

ছোটগল্পের ইতিহাস সুদীর্ঘ কালের। রূপকথায়, উপকথায়, নীতিগল্পে ও লোককাহিনিতে ছোটগল্পের উপাদান রয়েছে। বাংলা সাহিত্যে গদ্য প্রতিষ্ঠার সূত্র ধরে ছোটগল্পেরও বিকাশ হয়েছে। তবে উনিশ শতকের একেবারে শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথের হাতেই বাংলা ছোটগল্প শিল্পের যথার্থ রূপ ফুটে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের পরে মেধাবী কথাশিল্পীদের কল্যাণে বাংলা ছোটগল্প বিশ্বমান অর্জন করে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা সাহিত্য-সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে ওঠে। বাংলাদেশি ছোটগল্পের প্রথম পর্যায়ের লেখকদের মধ্যে রয়েছেন আবুল মনসুর আহমদ, আবুল ফজল, মাহবুব উল আলম, আবু জাফর শামসুদ্দীন, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ প্রমুখ। আবুল মনসুর আহমদ 'আয়না' নামের ব্যঙ্গ গল্পগ্রন্থ লিখে বিশেষ খ্যাতিমান হন। মাহবুব উল আলম, আবুল ফজল, আবু জাফর শামসুদ্দীন জীবনধর্মী গল্প লিখেছেন। এঁদের সমকালীন আরো যে কয়েকজন গল্পলেখক বাংলাদেশি গল্পের ধারাকে সমৃদ্ধ করেছিলেন এঁদের মধ্যে শওকত ওসমান, আবু ইসহাক, আবু রুশদ ও সরদার জয়েনউদ্দীন উল্লেখযোগ্য। এঁরা বাংলাদেশের গল্পসাহিত্যে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন রচনাটি বাংলা সাহিত্যে প্রথম ছোটগল্প?

ক. আয়না খ. কথামালা

গ. মধুমতী ঘ. আখ্যানমঞ্জরী

২. বাংলা গল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের প্রাধান্য যে কারণে–

ক. গল্পলেখকরা মধ্যবিত্ত শ্রেণির খ. নতুন জীবন-চিন্তার প্রকাশ ঘটায়

গ. গল্পলেখকরা মানবিক ধারার ঘ. মধ্যবিত্ত জীবনের রূপ-রূপান্তরে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

জীবনের খণ্ডাংশকে লেখক এক ধরনের গল্পে রস-নিবিড় করে সীমিত পরিসরে উপস্থাপন করেন। এ জাতীয় গল্পে থাকে মানবজীবনের নানা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, জীবনের কোনো বিশেষ অনুভূতি কিংবা উপলব্ধি।

৩. উদ্দীপকের মর্মার্থ যে বিষয়টির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ–

ক. ছোটগল্প খ. উপন্যাস

গ. উপকথা ঘ. নাটক

৪. উদ্দীপক ও পাঠ্য বিষয় অনুযায়ী যা ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য নয়–

ক. জীবনের বিস্তৃত উপাখ্যান। খ. চরিত্রসংখ্যা কম।

গ. আঁটোসাঁটো রচনা। ঘ. একটিমাত্র বক্তব্য।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. ছোটগল্পে গ্রামীণ জীবনের রূপকার হচ্ছেন–

ক. আবুল মনসুর আহমদ খ. জ্যোতি প্রকাশ দত্ত

গ. শামসুদ্দীন আবুল কালাম ঘ. রাহাত খান

৬. ছোটগল্প হচ্ছে মানবজীবনের–

ক. তাৎপর্যপূর্ণ অংশ খ. বিস্তৃত উপাখ্যান

গ. বহুমাত্রিক উপস্থাপন ঘ. শিথিল পরিসমাপ্তি

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

গল্পের ইতিহাস মানুষের আদি ইতিহাসের মতোই পুরাতন। জীবনের গল্পের মতোই এই গল্পও আদি-অনন্ত। বলা যায়, পুরাকালের গল্প হতেই আধুনিক বিশ্বে ছোটগল্পের সূত্রপাত।

৭. উদ্দীপকের ভাববস্তুর সঙ্গে পাঠ্যাংশের যে বিষয়ের সাদৃশ্য রয়েছে–

ক. ধর্মকথা খ. প্রাচীন গল্প

গ. পুরাণ ঘ. আখ্যান

৮. এরূপ সাদৃশ্যের অন্তর্নিহিত কারণ–

ক. ছোটগল্পের জন্মকথা খ. উপন্যাসের জন্মকথা

গ. পুরাণের জন্মবৃত্তান্ত ঘ. আখ্যায়িকার জন্মবৃত্তান্ত

সৃজনশীল প্রশ্ন :

জীবনের খণ্ডাংশকে সীমিত পরিসরে উপস্থাপন করাই ছোটগল্পের কাজ। এর শুরুতে যেমন আকস্মিকতা থাকে, তেমনি পরিসমাপ্তিও নাটকীয়। বস্তুত ছোটগল্প হল মানবজীবনের দু'একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার সমাহার। বাংলা সাহিত্যে উনিশ শতকের শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথের হাতে ছোটগল্পের যথার্থ রূপ ফুটে উঠে। গত শতকে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় এদেশের গল্পের ভুবনে নতুন উদ্দীপনা ও জীবনচিন্তার প্রকাশ ঘটায়। এভাবে বাংলাদেশের ছোটগল্পে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে

গুরুত্বপূর্ণ উপজীব্য। এ সময়কার ছোটগল্পে মুক্তিযুদ্ধের সার্থক চিত্রায়ণ দেখা যায়। এ ছাড়া সমাজ-জীবনের নানা অসঙ্গতি ও দ্বন্দ্ব, আর্থিক টানাপোড়েন, মূল্যবোধের অবক্ষয় এগুলোর অভিঘাতও এসেছে। ফলে ছোটগল্পের উপস্থাপনা ও ভাষারীতিতেও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

ক. 'গল্পগুচ্ছ' কোন লেখকের সঙ্কলন গ্রন্থ?

খ. বাংলাদেশের ছোটগল্পে ভাষা আন্দোলনের প্রভাব সম্পর্কে লিখুন।

গ. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপকে বাংলা ছোটগল্পের একটি বিশেষ কালের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।" –আপনার পাঠ্যাংশের আলোকে মন্তব্যটি বিচার করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন-১

ক.

'গল্পগুচ্ছ' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ছোটগল্পসমূহের সংকলন গ্রন্থ।

খ.

ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের ছোটগল্পকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতে নতুন চেতনা ও জীবন-চিন্তার বিকাশ ঘটায়। বাংলাদেশের ছোটগল্পে এই আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল হচ্ছে নতুন প্রজন্মের গল্প-লেখকদের আর্বিভাব। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন গ্রাম জীবনের রূপকার। তাঁরা একদিকে যেমন ছিলেন সমাজ-মনস্ক শ্রেণি সচেতন লেখক, অন্যদিকে মানুষের মনোলোকের রহস্যও সন্ধান করেছেন। নাগরিক জীবনের বিচিত্র প্রসঙ্গ তাঁদের লেখায় ফুটে উঠেছে।

গ.

ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য বর্ণনার দিক থেকে উদ্দীপকের বিষয়বস্তু পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

সাহিত্যে ছোটগল্প একটি বিশেষ ধরনের রচনা। এটি এমন এক সংক্ষিপ্ত গদ্য রচনা যা জীবনের দু'একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাকে অবলম্বন করে রচিত হয়। ছোটগল্পে লেখকের ব্যক্তিগত অনুভূতি ও ধারণাগত বক্তব্যকে একমুখী রূপ দেওয়া হয়। উদ্দীপকে বলা হয়েছে, ছোটগল্প জীবনের খণ্ডাংশকে সীমিত পরিসরে উপস্থাপন করে। এর শুরুটা যেমন আকস্মিক হয় তেমনি তার পরিণতিও নাটকীয়তায় ভরা থাকে। এছাড়া ছোটগল্প মানবজীবনের ক্ষুদ্রক্ষুদ্র তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাসমূহকে ধারণ করে। অন্যদিকে, পাঠ্যবিষয়ে ছোটগল্পের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, জীবনের কোনো বিশেষ সমস্যা বা সংকটই হচ্ছে ছোটগল্পের উপজীব্য। ছোটগল্প কথার বাহুল্য বর্জন করে পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। আর ছোটগল্পে লেখকের ব্যক্তিত্বের ছাপ অনুভূত হয়। তাই বলা যায়, ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য বর্ণনার দিক থেকে উদ্দীপকের বিষয়বস্তু পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়েছে।

ঘ.

উদ্দীপকে বাংলা ছোটগল্পের বিশেষ কালের রূপটি ফুটে উঠেছে।

ছোটগল্প আধুনিক কালের সৃষ্টি। ছোটগল্প গদ্যে রচিত শিল্পকর্ম। উপন্যাসের মতো কাহিনির বিস্তৃতি ছোটগল্পে থাকে না, অনেকটা আঁটোসাঁটো বন্ধনের হয়ে থাকে। আর ছোটগল্পের কাহিনি একমুখী থাকে বলে এটি দ্রুত পরিণামমুখী হয়।

উদ্দীপকে রবীন্দ্র-পরবর্তী মুক্তিযুদ্ধকালের বাংলা ছোটগল্পের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় এদেশের গল্পের ভুবনে নতুন উদ্দীপনা ও জীবনচিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছে। এ সময়ে রচিত ছোটগল্পসমূহে মুক্তিযুদ্ধের চিত্র ফুটে উঠেছে। এ ছাড়া সমাজ-জীবনের নানা অসঙ্গতি ও দ্বন্দ্ব, আর্থিক টানাপোড়েন, মূল্যবোধের অবক্ষয় ইত্যাদি বিষয়গুলোও লেখকদের চোখ এড়িয়ে যায়নি। অন্যদিকে, পাঠ্যবিষয়েও বলা হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধ বাংলা ছোটগল্পের ভুবনে নিয়ে এসেছে নতুন উদ্দীপনা ও উৎসাহ। এ ছাড়া মুক্তিযুদ্ধ বাংলা ছোটগল্প লেখকদের নতুন আলোয় আলোকিত করে।

উদ্দীপক এবং পাঠ্য বিষয় উভয়ের অন্বিষ্ট মুক্তিযুদ্ধ এবং তৎপরবর্তীকালের বাংলা ছোটগল্প। উভয়টিতে বলা হয়েছে, স্বাধীন বাংলাদেশে ছোটগল্প চর্চার ক্ষেত্র অধিকতর প্রশস্ত হয়। এছাড়া গল্পের ভাষারীতিতেও পরিবর্তন এসেছে। তবে পাঠ্যবিষয়ে বাংলা ছোটগল্পের একটি ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস উপস্থাপনের প্রয়াস রয়েছে। এটি উদ্দীপকে উপস্থাপিত হয়নি। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে কেবল বাংলা ছোটগল্পের একটি বিশেষ কালের আবহই ফুটে উঠেছে।

অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

আমি কেবলমাত্র হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় ধরে এনে হ্যান্ডশ্যাক করাবার চেষ্টা করেছি, গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি। সে হাতে হাত মিলানো যদি হাতাহাতির চেয়েও অশোভন হয়ে থাকে, তাহলে ওরা আপনি আলাদা হয়ে যাবে, আমার গাঁটছড়ার বাঁধন কাটতে তাদের কোনো বেগ পেতে হবে না। কেননা, একজনের হাতে আছে লাঠি, আর একজনের আস্তিনে আছে ছুরি।

ক. ছোটগল্পের যথার্থ বিকাশ ঘটে কোন দেশে?
খ. পৃথিবীর প্রাচীন গল্পগুলোর মধ্যে মিল দেখা যায় কেন?
গ. উদ্দীপকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে ছোটগল্পের বৈসাদৃশ্য কোথায়? –আলোচনা করুন।
ঘ. "উদ্দীপকটি ছোটগল্পের চেতনাকে ধারণ করে না।" –বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গ ২. ক ৩. ক ৪. ক ৫. গ ৬. ক ৭. খ ৮. ক

শাস্তি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পগুচ্ছ প্রথম খণ্ড (১৯০০) ও অখণ্ড (১৯২৭) থেকে 'শাস্তি' গল্পটি সংকলিত হয়েছে। 'শাস্তি' গল্প প্রথম প্রকাশিত হয় *সাধনা* পত্রিকায় ১৩০০ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায়। প্রায় সোয়াশো বছর পূর্বে রচিত এই গল্প বাঙালি ছোটগাল্পিকদের কাছে এখনও রীতিমতো এক বিস্ময়ের বিষয়। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ একজন রোমান্টিক কবি 'শাস্তি'র মতো একটি অসাধারণ বাস্তবমুখী গল্প লিখেছেন প্রায় সোয়াশো বছর পূর্বে, একথা ভাবলে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়। জমিদার রবীন্দ্রনাথ জমিদারি দেখভালের জন্য পূর্ববাংলার শিলাইদহ-সাজাদপুর-পরিসরে দীর্ঘ দশ বছর (১৮৯১-১৯০০) কাটিয়েছেন। সে সময় তিনি ভূমিহীন দরিদ্র চাষিদের দুঃখ-দুরবস্থা কাছ থেকে দেখেছেন। সেই অভিজ্ঞতাই 'শাস্তি' গল্পে রূপলাভ করেছে।

সাধারণ উদ্দেশ্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শাস্তি' গল্পটি পাঠের পর আপনি–

- রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পবৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবেন।
- ছোটগল্প হিসেবে 'শাস্তি'র সার্থকতা বিচার করতে পারবেন।
- গল্পের নাম কেন 'শাস্তি' হল তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- 'শাস্তি' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র চন্দরা-চরিত্র ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ভূমিহীন দরিদ্র চাষির জীবন-বাস্তবতা আলোচনা করতে পারবেন।

পাঠ–১

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- দুখিরাম ও ছিদামের চরিত্রবৈশিষ্ট্য লিখতে পারবেন।
- দুখিরামের হাতে রাধা কীভাবে খুন হলো, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ভূমিহীন দরিদ্র চাষির উপর জমিদারদের নির্যাতন ও লাঞ্ছনা বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

প্রথম পরিচ্ছেদ [সম্পাদনা]

দুখিরাম রুই এবং ছিদাম রুই দুই ভাই সকালে যখন দা হাতে লইয়া জন খাটিতে বাহির হইল তখন তাহাদের দুই স্ত্রীর মধ্যে বকাবকি চেঁচামেচি চলিতেছে। কিন্তু, প্রকৃতির অন্যান্য নানাবিধ নিত্যকলরবের ন্যায় এই কলহ-কোলাহলও পাড়াসুদ্ধ লোকের অভ্যাস হইয়া গেছে। তীব্র কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র লোকে পরস্পরকে বলে, "ঐ রে বাধিয়া গিয়াছে।" অর্থাৎ, যেমনটি আশা করা যায় ঠিক তেমনটি ঘটিয়াছে, আজও স্বভাবের নিয়মের কোনোরূপ ব্যত্যয় হয় নাই। প্রভাতে পূর্ব দিকে সূর্য উঠিলে যেমন কেহ তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করে না তেমনি এই কুরিদের বাড়তি দুই জায়ের মধ্যে যখন একটা হৈ-হৈ পড়িয়া যায় তখন তাহার কারণ নির্ণয়ের জন্য কাহারও কোনোরূপ কৌতূহলের উদ্রেক হয় না।

অবশ্য এই কোন্দল-আন্দোলন প্রতিবেশীদের অপেক্ষা দুই স্বামীকে বেশি স্পর্শ করিত সন্দেহ নাই, কিন্তু সেটা তাহারা কোনোরূপ অসুবিধার মধ্যে গণ্য করিত না। তাহারা দুই ভাই যেন দীর্ঘ সংসারপথ একটা এক্কাগাড়িতে করিয়া চলিয়াছে, দুই দিকের দুই স্প্রিংবিহীন চাকার অবিশ্রাম ছড়ু ছড়ু খড়ু খড়ু শব্দটাকে জীবনরথযাত্রার একটা বিধিবিহিত নিয়মের মধ্যেই ধরিয়া লইয়াছে। বরঞ্চ ঘরে যে দিন কোনো শব্দমাত্র নাই, সমস্ত থম্‌থম্‌ ছম্‌ছম্‌ করিতেছে, সে দিন একটা আসন্ন অনৈসর্গিক উপদ্রবের আশঙ্কা জন্মিত, সেদিন যে কখন কী হইবে তাহা কেহ হিসাব করিয়া বলিতে পারিত না।

আমাদের গল্পের ঘটনা যেদিন আরম্ভ হইল সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে দুই ভাই যখন জন খাটিয়া শ্রান্তদেহে ঘরে ফিরিয়া আসিল তখন দেখিল স্তব্ধ গৃহ গম্‌গম্‌ করিতেছে।

বাহিরেও অত্যন্ত গুমট। দুই-প্রহরের সময় খুব এক-পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এখনো চারি দিকে মেঘ জমিয়া আছে। বাতাসের লেশমাত্র নাই। বর্ষায় ঘরের চারি দিকে জঙ্গল এবং আগাছাগুলা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে, সেখানে হইতে এবং জলমগ্ন পাটের খেত হইতে সিক্ত উদ্ভিজ্জের ঘন গন্ধবাষ্প চতুর্দিকে একটি নিশ্চল প্রাচীরের মতো জমাট হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। গোয়ালের পশ্চাদ্বর্তী ডোবার মধ্য হইতে ভেক ডাকিতেছে এবং ঝিল্লিরবে সন্ধ্যার নিস্তব্ধ আকাশ একেবারে পরিপূর্ণ।

অদূরে বর্ষার পদ্মা নবমেঘচ্ছায়ায় বড়ো স্থির ভয়ংকর ভাব ধারণ করিয়া চলিয়াছে। শস্যেক্ষেত্রর অধিকাংশই ভাঙিয়া লোকালয়ের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। এমন-কি, ভাঙনের ধারে দুই-চারিটা আম-কাঁঠাল গাছের শিকড় বাহির হইয়া দেখা দিয়াছে, যেন তাহাদের নিরুপায় মুষ্টির প্রসারিত অঙ্গুলিগুলি শূন্যে একটা-কিছু অন্তিম অবলম্বন আঁকড়িয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছে।

দুখিরাম এবং ছিদাম সেদিন জমিদারের কাছারি-ঘরে কাজ করিতে গিয়াছিল। ও পারের চরে জলিধান পাকিয়াছে। বর্ষায় চর ভাসিয়া যাইবার পূর্বেই ধান কাটিয়া লইবার জন্য দেশের দরিদ্র লোক মাত্রেই কেহ বা নিজের খেতে কেহ বা পাট খাটিতে নিযুক্ত হইয়াছে; কেবল কাছারি হইতে পেয়াদা আসিয়া এই দুই ভাইকে জবর্দস্তি করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল। কাছারি-ঘরে চাল ভেদ করিয়া স্থানে স্থানে জল পড়িতেছিল তাহাই সারিয়া দিতে এবং গোটাকতক ঝাঁপ নির্মাণ করিতে তাহারা সমস্ত দিন খাটিয়াছে। বাড়ি আসিতে পায় নাই, কাছারি হইতেই কিঞ্চিৎ জলপান খাইয়াছে। মধ্যে মধ্যে বৃষ্টিতেও ভিজিতে হইয়াছে - উচিতমত পাওনা মজুরি পায় নাই, এবং তাহার পরিবর্তে যে সকল অন্যায় কটু কথা শুনিতে হইয়াছে, সে তাহাদের পাওনার অনেক অতিরিক্ত।

পথের কাদা এবং জল ভাঙিয়া সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দুই ভাই দেখিল, ছোটো জা চন্দরা ভূমিতে অঞ্চল পাতিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া আছে - আজিকার এই মেঘলা দিনের মতো সেও মধ্যাহ্নে প্রচুর অশ্রুবর্ষণপূর্বক সায়াহ্নের কাছাকাছি ক্ষান্ত দিয়া অত্যন্ত গুমট করিয়া আছে; আর বড়ো জা রাধা মুখটা মস্ত করিয়া দাওয়ায় বসিয়া ছিল; তাহার দেড় বৎসরের ছোটো ছেলেটি কাঁদিতেছিল। দুই ভাই যখন প্রবেশ করিল দেখিল, উলঙ্গ শিশু প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে চিৎ হইয়া পড়িয়া ঘুমাইয়া আছে।

ক্ষুধিত দুখিরাম আর কালবিলম্ব না করিয়া বলিল, “ভাত দে।”

বড়োবউ বারুদের বস্তায় স্ফুলিঙ্গপাতের মতো এক মুহূর্তেই তীব্র কণ্ঠস্বর আকাশ-পরিমাণ করিয়া বলিয়া উঠিল, “ভাত কোথায় যে ভাত দিব। তুই কি চাল দিয়া গিয়াছিলি। আমি কি নিজে রোজগার করিয়া আনিব।”

সারাদিনের শ্রান্তি ও লাঞ্ছনার পর অন্নহীন নিরানন্দ অন্ধকার ঘরে প্রজ্বলিত ক্ষুধানলে, গৃহিণীর রুক্ষ বচন, বিশেষত শেষ কথাটার গোপন কুৎসিত শ্লেষ দুখিরামের হঠাৎ কেমন একেবারেই অসহ্য হইয়া উঠিল। বাকরুদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় গম্ভীর গর্জনে বলিয়া উঠিল, “কী বললি !” বলিয়া মুহূর্তের মধ্যে দা লইয়া কিছু না ভাবিয়া একেবারে স্ত্রীর মাথায় বসাইয়া দিল। রাধা তাহার ছোটো জায়ের কোলের কাছে পড়িয়া গেল এবং মৃত্যু হইতে মুহূর্ত বিলম্ব হইল না।

চন্দরা রক্তসিক্ত বস্ত্রে “কী হল গো” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। ছিদাম তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। দুখিরাম দা ফেলিয়া মুখে হাত দিয়া হতবুদ্ধির মতো ভূমিতে বসিয়া পড়িল। ছেলেটা জাগিয়া উঠিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। বাহিরে তখন পরিপূর্ণ শান্তি। রাখালবালক গোরু লইয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিতেছে। পরপারের চরে যাহারা নূতনপক্ক ধান কাটিতে গিয়াছিল তাহারা পাঁচ-সাতজনে এক-একটি ছোটো নৌকায় এ পারে ফিরিয়া পরিশ্রমের পুরস্কার দুই চারি আঁটি ধান মাথায় লইয়া প্রায় সকলেই নিজ নিজ ঘরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

চক্রবর্তীদের বাড়ির রামলোচন খুড়ো গ্রামের ডাকঘরে চিঠি দিয়া ঘরে ফিরিয়া নিশ্চিন্তমনে চুপচাপ তামাক খাইতেছিলেন। হঠাৎ মনে পড়িল, তাঁহার কোর্ফা প্রজা দুখির অনেক টাকা খাজনা বাকি ; আজ কিয়দংশ শোধ করিবে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। এতক্ষণে তাহারা বাড়ি ফিরিয়াছে স্থির করিয়া, চাদরটা কাঁধে ফেলিয়া, ছাতা লইয়া বাহির হইলেন।

কুরিদের বাড়িতে ঢুকিয়া তাঁহার গা ছম্‌ ছম্‌ করিয়া উঠিল। দেখিলেন, ঘরে প্রদীপ জ্বালা হয় নাই। অন্ধকার দাওয়ায় দুই-চারিটা অন্ধকার মূর্তি অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। রহিয়া রহিয়া দাওয়ার এক কোণ হইতে একটা অস্ফুট রোদন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে - এবং ছেলেটা যত 'মা মা' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিতে চেষ্টা করিতেছে ছিদাম তাহার মুখ চাপিয়া ধরিতেছে।

রামলোচন কিছু ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দুখি, আছিস নাকি।" দুখি এতক্ষণ প্রস্তরমূতির মতো নিশ্চল হইয়া বসিয়া ছিল, তাহার নাম ধরিয়া ডাকিবামাত্র একেবারে অবোধ বালকের মতো উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। ছিদাম তাড়াতাড়ি দাওয়া হইতে অঙ্গনে নামিয়া চক্রবর্তীর নিকটে আসিল। চক্রবর্তী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাগীরা বুঝি ঝগড়া করিয়া বসিয়া আছে? আজ তো সমস্ত দিনই চীৎকার শুনিয়াছি।"

এতক্ষণ ছিদাম কিংকর্তব্য কিছুই ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই। নানা অসম্ভব গল্প তাহার মাথায় উঠিতেছিল। আপাতত স্থির করিয়াছিল, রাত্রি কিঞ্চিৎ অধিক হইলে মৃতদেহ কোথাও সরাইয়া ফেলিবে। ইতিমধ্যে যে চক্রবর্তী আসিয়া উপস্থিত হইবে, এ সে মনেও করে নাই। ফস্‌ করিয়া কোনো উত্তর জোগাইল না। বলিয়া ফেলিল, "হাঁ, আজ খুব ঝগড়া হইয়া গিয়াছে।" চক্রবর্তী দাওয়ার দিকে অগ্রসর হইবার উপক্রম করিয়া বলিল, "কিন্তু সেজন্য দুখি কাঁদে কেন রে।"

ছিদাম দেখিল, আর রক্ষা হয় না ; হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "ঝগড়া করিয়া ছোটোবউ বড়োবউয়ের মাথায় এক দায়ের কোপ বসাইয়া দিয়াছে।"

উপস্থিত বিপদ ছাড়া যে আর-কোনো বিপদ থাকিতে পারে, এ কথা সহজে মনে হয় না। ছিদাম তখন ভাবিতেছিল, 'ভীষণ সত্যের হাত হইতে কী করিয়া রক্ষা পাইব।' মিথ্যা যে তদপেক্ষা ভীষণ হইতে পারে তাহা তাহার জ্ঞান হইল না। রামলোচনের প্রশ্ন শুনিবামাত্র তাহার মাথায় তৎক্ষণাৎ একটা উত্তর জোগাইল এবং তৎক্ষণাৎ বলিয়া ফেলিল।

রামলোচন চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "অ্যাঁ! বলিস কী! মরে নাই তো !"

ছিদাম কহিল, "মরিয়াছে।" বলিয়া চক্রবর্তীর পা জড়াইয়া ধরিল।

চক্রবর্তী পালাইবার পথ পায় না। ভাবিল, 'রাম রাম ! সন্ধ্যাবেলায় এ কী বিপদেই পড়লিাম। আদালতে সাক্ষ্য দিতে দিতেই প্রাণ বাহির হইয়া পড়িবে !' ছিদাম কিছুতেই তাঁহার পা ছাড়লি না; কহিল, "দাদাঠাকুর, এখন আমার বউকে বাঁচাইবার কী উপায় করি।"

মামলা-মোকদ্দমার পরামর্শে রামলোচন সমস্ত গ্রামের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি একটু ভাবিয়া বলিলেন, "দেখ, ইহার এক উপায় আছে। তুই এখনই থানায় ছুটিয়া যা - বল গে, তোর বড়ো ভাই দুখি সন্ধ্যাবেলায় ঘরে আসিয়া ভাত চাহিয়াছিল, ভাত প্রস্তুত ছিল না বলিয়া স্ত্রীর মাথায় দা বসাইয়া দিয়াছে। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, এ কথা বলিলে ছুঁড়িটা বাঁচিয়া যাইবে।"

ছিদামের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিল; উঠিয়া কহিল, "ঠাকুর, বউ গেলে বউ পাইব, কিন্তু আমার ভাই ফাঁসি গেলে আর তো ভাই পাইব না।" কিন্তু, যখন নিজের স্ত্রীর নামে দোষারোপ করিয়াছিল তখন এ-সকল কথা ভাবে নাই। তাড়াতাড়িতে একটা কাজ করিয়া ফেলিয়াছে, এখন অলতিভাবে মন আপনার পক্ষে যুক্তি এবং প্রবোধ সঞ্চয় করিতেছে।

চক্রবর্তীও কথাটা যুক্তিসংগত বোধ করিলেন ; কহিলেন "তবে যেমনটি ঘটিয়াছে তাই বলিস, সকল দিক রক্ষা করা অসম্ভব!"

বলিয়া রামলোচন অবিলম্বে প্রস্থান করিল এবং দেখিতে দেখিতে গ্রামে রাষ্ট্র হইল যে, কুরিদের বাড়ির চন্দরা রাগারাগি করিয়া তাহার বড়ো জায়ের মাথায় দা বসাইয়া দিয়াছে।

বাঁধ ভাঙিলে যেমন জল আসে গ্রামের মধ্যে তেমনি হুহু শব্দে পুলিস আসিয়া পড়িল ; অপরাধী এবং নিরপরাধী সকলেই বিষম উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অঙ্গন– উঠান। **অঞ্চল–** এলাকা; এখানে শাড়ির আঁচল অর্থে ব্যবহৃত। **অনৈসর্গিক–** অলৌকিক, অস্বাভাবিক। **উদ্ভিজ্জ–** উদ্ভিদজগৎ। **উপদ্রব–** উৎপাত, অত্যাচার, বিপদ। **এক্কাগাড়ি–** দুই চাকাবিশিষ্ট এক ঘোড়ার গাড়ি। **কোর্ফা প্রজা–** ভূমিহীন চাষি, খাজনার বিনিময়ে জমিদারের জমিতে বসবাসরত প্রজা। **ক্ষুধানলে–** ক্ষুধার আগুনে। **জন খাটিতে–** মজুরি খাটতে। **দাওয়া–** বারান্দা, রোয়াক। **পেয়াদা–** সংবাদবাহক, দূত; এখানে চাপরাশি অর্থে ব্যবহৃত। **প্রধানমন্ত্রী–** মন্ত্রিসভার প্রধান যিনি; এখানে দক্ষ বা অভিজ্ঞ অর্থে ব্যবহৃত। **বিষম–** দারুণ, সাঙ্ঘাতিক, কঠিন; এখানে ভয়ানক অর্থে ব্যবহৃত। **ব্যত্যয়–** ব্যতিক্রম, বিপরীত কিছু, অন্যথা। **ভেক–** ব্যাঙ। **সায়াহ্ন-** সন্ধ্যা, সাঁঝ। **রাষ্ট্র হইল–** এখানে প্রচারিত হওয়া অর্থে ব্যবহৃত। **লোকালয়–** জনবসতি, যেখানে মানুষ বাস করে।

সারসংক্ষেপ :

দুখিরাম ও ছিদাম দুই ভাই। আর্থিকভাবে খুবই দরিদ্র তারা। অন্যের জমিতে বাস করে, মজুরি খেটে কোনো রকমে জীবিকা নির্বাহ করে। দুই ভাইয়ের মধ্যে মিল থাকলেও তাদের স্ত্রী রাধা ও চন্দরা সব সময় কলহ করত। একদিন দুখিরাম কাজ শেষে বাড়ি ফিরে স্ত্রী রাধার কাছে ভাত চায়। ঘরে চাল না থাকায় রাধা দুখিরামকে ভাত দিতে পারল না। উল্টো বলল– 'আমি কি নিজে রোজগার করিয়া আনিব।' একে পেটে ক্ষুদা, তার ওপর এই কথাটার গোপন কুৎসিত ইঙ্গিতে দুখিরাম ক্ষিপ্ত হয়ে রাধার মাথায় দায়ের কোপ বসিয়ে দেয়। ফলে রাধা মারা যায়। ভাইকে বাঁচানোর জন্য ছিদাম চেয়েছিল রাধার মৃতদেহ কোথাও সরিয়ে ফেলবে। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা খাজনা আদায় করার জন্য রামলোচন চক্রবর্তী দুখিরামের বাড়িতে আসে। ফলে রাধার হত্যাকাণ্ডের কথা জেনে যায় রামলোচন। ক্রমে অতি দ্রুত সারা এলাকায় কথাটা ছড়িয়ে পড়ে এবং পুলিশ এসে হাজির হয়। সকলেই বিষম বিপদে পড়ে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. মামলা-মোকদ্দমার পরামর্শে সমস্ত গ্রামের প্রধানমন্ত্রী কে?

ক. রামলোচন মজুমদার　　খ. দুখিরাম রুই
গ. ছিদাম রুই　　ঘ. রামলোচন চক্রবর্তী

২. দুখিরাম বড় বউয়ের মাথায় দা' বসিয়ে দিয়েছিল যে কারণে–

ক. ভাত দিতে দেরি হওয়ায়　　খ. বড় বউয়ের কুৎসিত শ্লেষে
গ. চন্দরার সঙ্গে ঝগড়া হওয়ায়　　ঘ. শিশু সন্তান কান্নাকাটি করায়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

নীলকরদের আবির্ভাবে বাংলার চাষিরা আপন জমি হারিয়ে নিজ জমি বর্গা নিয়ে চাষ করত। কখনও কখনও বেগারও খাটতে হত তাদের। এভাবে কঠোর পরিশ্রম করে তারা ফসলের যে ভাগ পেতো তাতে জীবিকা নির্বাহ হত না। ফলে সংসারে অশান্তি লেগেই থাকত।

৩. উদ্দীপকের চাষির সঙ্গে 'শাস্তি' গল্পে কাদের সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. দুখিরাম রুই ও ছিদাম রুই　　খ. জমিদার ও পেয়াদা
গ. পুলিশ ও সেশন জজ　　ঘ. রামলোচন চক্রবর্তী ও কাশীনাথ মজুমদার

৪. উদ্দীপক ও 'শাস্তি' গল্পে প্রকাশ পেয়েছে–

i. শ্রেণি শোষণ
ii. ছিদামের জবরদস্তি
iii. পেয়াদার দ্রোহ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. ii ও iii

পাঠ-২

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- ভাইকে বাঁচানোর জন্য ছিদামের কপট উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ছিদাম ও চন্দরার দাম্পত্য সম্পর্কের পরিচয় দিতে পারবেন।
- দুখিরাম-ছিদাম এবং রাধা-চন্দরা চরিত্রের তুলনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ [সম্পাদনা]

ছিদাম ভাবিল, যে পথ কাটিয়া ফেলিয়াছে সেই পথেই চলিতে হইবে। সে চক্রবর্তীর কাছে নিজমুখে এক কথা বলিয়া ফেলিয়াছে, সে কথা গাঁ-সুদ্ধ রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছে ; এখন আবার আর-একটা কিছু প্রকাশ হইয়া পড়িলে কী জানি কী হইতে কী হইয়া পড়িবে সে নিজেই কিছু ভাবিয়া পাইল না। মনে করিল, কোনোমতে সে কথাটা রক্ষা করিয়া তাহার সহিত আর পাঁচটা গল্প জুড়িয়া স্ত্রীকে রক্ষা করা ছাড়া আর কোনো পথ নাই।

ছিদাম তাহার স্ত্রী চন্দরাকে অপরাধ নিজ স্কন্ধে লইবার জন্য অনুরোধ করিল। সে তো একেবারে বজ্রাহত হইয়া গেল। ছিদাম তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল, “যাহা বলিতেছি তাই কর, তোর কোনো ভয় নাই, আমরা তোকে বাঁচাইয়া দিব।” আশ্বাস দিল বটে কিন্তু গলা শুকাইল, মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল।

চন্দরার বয়স সতেরো-আঠারোর অধিক হইবে না। মুখখানি হৃষ্টপুষ্ট গোলগাল; শরীরটি অনতিদীর্ঘ; আঁটসাঁট; সুস্থসবল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে এমন একটি সৌষ্ঠব আছে যে চলিতে-ফিরিতে নড়িতে-চড়িতে দেহের কোথাও যেন কিছু বাধে না। একখানি নূতন-তৈরি নৌকার মতো; বেশ ছোটো এবং সুডোল, অত্যন্ত সহজে সরে এবং তাহার কোথাও কোনো গ্রন্থি শিথিল হইয়া যায় নাই। পৃথিবীর সকল বিষয়েই তাহার একটা কৌতুক এবং কৌতূহল আছে ; পাড়ায় গল্প করিতে যাইতে ভালোবাসে, এবং কুম্ভ কক্ষে ঘাটে যাইতে-আসিতে দুই অঙ্গুলি দিয়া ঘোমটা ঈষৎ ফাঁক করিয়া উজ্জ্বল চঞ্চল ঘনকৃষ্ণ চোখ দু'টি দিয়া পথের মধ্যে দর্শনযোগ্য যাহা-কিছু সমস্ত দেখিয়া লয়।

বড়োবউ ছিল ঠিক ইহার উল্টা; অত্যন্ত এলোমেলো ঢিলেঢালা, অগোছালো। মাথার কাপড়, কোলের শিশু, ঘরকন্নার কাজ কিছুই সে সামলাইতে পারিত না। হাতে বিশেষ একটা কিছু কাজও নাই অথচ কোনো কালে যেন সে অবসর করিয়া উঠিতে পারে না। ছোটো জা তাহাকে অধিক কিছু কথা বলিত না, মৃদুস্বরে দুই-একটা তীক্ষ্ণ দংশন করিত, আর সে হাউ-হাউ দাউ-দাউ করিয়া রাগিয়া-মাগিয়া বকিয়া-ঝকিয়া সারা হইত এবং পাড়াসুদ্ধ অস্থির করিয়া তুলিত।

এই দুই জুড়ি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও স্বভাবের একটা আশ্চর্য ঐক্য ছিল। দুখিরাম মানুষটা কিছু বৃহদায়তনের– হাড়গুলা খুব চওড়া, নাসিকা খর্ব, দুটি চক্ষু এই দৃশ্যমান সংসারকে যেন ভালো করিয়া বোঝে না, অথচ ইহাকে কোনোরূপ প্রশ্ন করিতেও চায় না। এমন নিরীহ অথচ ভীষণ, এমন সবল অচল নিরুপায় মানুষ অতি দুর্লভ।

আর ছিদামকে একখানি চক্‌চকে কালো পাথরে কে যেন বহু যত্নে কুঁদিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। লেশমাত্র বাহুল্য-বর্জিত এবং কোথাও যেন কিছু টোল খায় নাই। প্রত্যেক অঙ্গটি বলের সহিত নৈপুণ্যের সহিত মিশিয়া অত্যন্ত সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। নদীর উচ্চ পাড় হইতে লাফাইয়া পড়ুক, লগি দিয়া নৌকা ঠেলুক, বাঁশগাছে চড়িয়া বাছিয়া বাছিয়া কঞ্চি কাটিয়া আনুক, সকল কাজেই তাহার একটি পরিমিত পারিপাট্য, একটি অবলীলাকৃত শোভা প্রকাশ পায়। বড়ো বড়ো কালো চুল তেল দিয়া কপাল হইতে যত্নে আঁচড়াইয়া তুলিয়া কাঁধে আনিয়া ফেলিয়াছে– বেশভূষা সাজসজ্জায় বিলণ একটু যত্ন আছে।

অপরাপর গ্রামবধূদিগের সৌন্দর্যের প্রতি যদিও তাহার উদাসীন দৃষ্টি ছিল না, এবং তাহাদের চক্ষে আপনাকে মনোরম করিয়া তুলিবার ইচ্ছা তাহার যথেষ্ট ছিল– তবু ছিদাম তাহার যুবতী স্ত্রীকে একটু বিশেষ ভালোবাসিত। উভয়ে ঝগড়াও হইত, ভাবও হইত, কেহ কাহাকেও পরাস্ত করিতে পারিত না। আর-একটি কারণে উভয়ের মধ্যে বন্ধন কিছু সুদৃঢ় ছিল। ছিদাম

মনে করিত, চন্দরা যেরূপ চটুল চঞ্চল প্রকৃতির স্ত্রীলোক, তাহাকে যথেষ্ট বিশ্বাস নাই; আর চন্দরা মনে করিত, আমার স্বামীটির চতুর্দিকেই দৃষ্টি, তাহাকে কিছু কষাকষি করিয়া না বাঁধিলে কোন্দিন হাতছড়া হইতে আটক নাই।

উপস্থিত ঘটনা ঘটিবার কিছুকাল পূর্বে হইতে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ভারি একটা গোলযোগ চলিতেছিল। চন্দরা দেখিয়াছিল, তাহার স্বামী কাজের ওজর করিয়া মাঝে মাঝে দূরে চলিয়া যায়, এমন-কি দুই-একদিন অতীত করিয়া আসে, অথচ কিছু উপার্জন করিয়া আনে না। লক্ষণ মন্দ দেখিয়া সেও কিছু বাড়াবাড়ি দেখাইতে লাগিল। যখন-তখন ঘাটে যাইতে আরম্ভ করিল এবং পাড়া পর্যটন করিয়া আসিয়া কাশী মজুমদারের মেজো ছেলেটির প্রচুর ব্যাখ্যা করিতে লাগিল।

ছিদামের দিন এবং রাত্রিগুলির মধ্যে কে যেন বিষ মিশাইয়া দিল। কাজে-কর্মে কোথাও এক দণ্ড গিয়া সুস্থির হইতে পারে না। একদিন ভাজকে আসিয়া ভারি ভর্ৎসনা করিল। সে হাত নাড়িয়া ঝংকার দিয়া অনুপস্থিত মৃত পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ও মেয়ে ঝড়ের আগে ছোটে, উহাকে আমি সামলাইব ! আমি জানি, ও কোনদিন কী সর্বনাশ করিয়া বসিবে?"

চন্দরা পাশের ঘর হইতে আসিয়া আস্তে আস্তে কহিল, "কেন দিদি, তোমার এত ভয় কিসের!" এই - দুই জায়ে বিষম দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল।

ছিদাম চোখ পাকাইয়া বলিল, "এবার যদি কখনো শুনি তুই একলা ঘাটে গিয়াছিস, তোর হাড় গুঁড়াইয়া দিব।"

চন্দরা বলিল, "তাহা হইলে তো হাড়জুড়ায়।" বলিয়া তৎক্ষণাৎ বাহিরে যাইবার উপক্রম করিল।

ছিদাম এক লম্ফে তাহার চুল ধরিয়া টানিয়া ঘরে পুরিয়া বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

কর্মস্থান হইতে সন্ধ্যাবেলায় ফিরিয়া আসিয়া দেখে ঘর খোলা, ঘরে কেহ নাই। চন্দরা তিনটে গ্রাম ছাড়াইয়া একেবারে তাহার মামার বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

ছিদাম সেখান হইতে বহু কষ্টে অনেক সাধ্যসাধনায় তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিল, কিন্তু এবার পরাস্ত মানিল। দেখিল, এক-অঞ্জলি পারদকে মুষ্টির মধ্যে শক্ত করিয়া ধরা যেমন দুঃসাধ্য এই মুষ্টিমেয় স্ত্রীটুকুকেও কঠিন করিয়া ধরিয়া রাখা তেমনি অসম্ভব-ও যেন দশ আঙুলের ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

আর-কোনো জবর্দস্তি করিল না, কিন্তু বড়ো অশান্তিতে বাস করিতে লাগিল। তাহার এই চঞ্চলা যুবতী স্ত্রীর প্রতি সদাশঙ্কিত ভালোবাসা উগ্র একটা বেদনার মতো বিষম টন্‌টনে হইয়া উঠিল। এমন-কি, এক-একবার মনে হইত, এ যদি মরিয়া যায় তবে আমি নিশ্চিন্ত হইয়া একটুখানি শান্তিলাভ করিতে পারি। মানুষের উপরে মানুষের যতটা ঈর্ষা হয় যমের উপরে এতটা নহে।

এমন সময়ে ঘরে সেই বিপদ ঘটিল।

চন্দরাকে যখন তাহার স্বামী খুন স্বীকার করিয়া লইতে কহিল সে স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া রহিল; তাহার কালো দুটি চক্ষু কালো অগ্নির ন্যায় নীরবে তাহার স্বামীকে দগ্ধ করিতে লাগিল। তাহার সমস্ত শরীর মন যেন ক্রমেই সংকুচিত হইয়া স্বামীরাক্ষসের হাত হইতে বাহির হইয়া আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা একান্ত বিমুখ হইয়া দাঁড়াইল।

ছিদাম আশ্বাস দিল, "তোমার কিছু ভয় নাই।" বলিয়া পুলিসের কাছে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে কী বলিতে হইবে বার বার শিখাইয়া দিল। চন্দরা সে-সমস্ত দীর্ঘ কাহিনি কিছুই শুনিল না, কাঠের মূর্তি হইয়া বসিয়া রহিল।

সমস্ত কাজেই ছিদামের উপর দুখিরামের একমাত্র নির্ভর। ছিদাম যখন চন্দরার উপর দোষারোপ করিতে বলিল দুখি বলিল, "তাহা হইলে বউমার কী হইবে।" ছিদাম কহিল, "উহাকে আমি বাঁচাইয়া দিব।" বৃহৎকায় দুখিরাম নিশ্চিন্ত হইল।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অনতিদীর্ঘ– বেশি দীর্ঘ নয় এমন। **ওজর–** অজুহাত, ছল, কৈফিয়ত। **কুঁদিয়া–** ছুতারের কুঁদ যন্ত্র দিয়ে কাটা বা মসৃণ করা হয়েছে এমন। **জবর্দস্তি–** জোর করে, বল প্রয়োগ করে। **দুর্লভ–** যা সহজে পাওয়া যায় না। **পারদ–** তরল ধাতুবিশেষ, পারা, mercury। **পাংশুবর্ণ–** ফ্যাকাশে রং, ম্লান, ধুলার মতো রং। **বজ্রাহত–** বজ্রপাতে আহত। **বৃহদায়তন–** বৃহৎ, বড় আকারের; এখানে দীর্ঘ শরীর অর্থে। **ভর্ৎসনা–** বকা, তিরস্কার, ধমক, নিন্দা। **মনোরম–** সুন্দর, সুশ্রী। **সুডোল–** সুন্দর আকার বিশিষ্ট, টোলহীন। **সৌষ্ঠব–** সৌন্দর্য, উৎকর্ষ। **স্কন্ধে–** কাঁধে। **স্তম্ভিত–** বিস্ময়ে স্তব্ধ। ।

সারসংক্ষেপ :

ছিদাম ভাবল, এলাকায় প্রচারিত হয়ে গেছে যে চন্দরা দায়ের কোপে রাধাকে হত্যা করেছে। কাজেই এখন অন্যকিছু বলা সম্ভব নয়। এবার সে স্ত্রীকে বাঁচানোর কথা চিন্তা করল। চন্দরার প্রতি ছিদামের ভালোবাসার কোনো কমতি ছিল না। ছিদাম চন্দরাকে খুনের দায় স্বীকার করে নেওয়ার কথা বলল। যাতে শাস্তি কম হয়, তাই ছিদাম চন্দরাকে নানা কল্পকথা শিখিয়ে দিল। কিন্তু চন্দরা তার কিছুই শুনল না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

৫. ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট চন্দরাকে কোথায় চালান দিয়েছিলেন?

ক. সেশনে খ. জেলখানায়
গ. থানায় ঘ. মুন্সেফ কোর্টে

৬. চন্দরার চোখ কীভাবে স্বামীকে দগ্ধ করেছিল?

ক. নিরবে অগ্নির ন্যায় খ. শঙ্কিত ভালোবাসায়
গ. ঈর্ষাকাতরতায় ঘ. তীক্ষ্ণ দংশনে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

স্বামীর নির্দেশে কপিলাকে দেবরের অপরাধের দায় নিজের মাথায় নিতে হয়। ভাইকে বাঁচানোর জন্য স্বামী নিরপরাধ স্ত্রীকে ফাঁসাতে চায়। ঘটনার আবর্তে কপিলা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে।

৭. উদ্দীপকের কপিলার সঙ্গে 'শাস্তি' গল্পের কোন চরিত্রটির সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. বড় বউ খ. চন্দরা
গ. রামলোচন ঘ. কাশি মজুমদার

৮. উদ্দীপকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে নিচের যে বাক্যের সাদৃশ্য রয়েছে–

ক. যখন তাহার স্বামী খুন স্বীকার করিয়া লইতে কহিল সে স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া রহিল।
খ. ও যেন দশ আঙুলের ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া পড়িবে।
গ. এমন সময় ঘরে সেই বিপদ ঘটিল। ঘ. কাঠের মূর্তি হইয়া বসিয়া রহিল।

পাঠ-৩

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- চন্দরার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিতে পারবেন ।
- গল্পে প্রকৃত শাস্তি কে পেয়েছে, তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।
- চন্দরাকে বাঁচানোর জন্য ছিদামের প্রচেষ্টা বর্ণনা করতে পারবেন ।

মূলপাঠ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ [সম্পাদনা]

ছিদাম তাহার স্ত্রীকে শিখাইয়া দিয়াছিল যে, "তুই বলিস, বড়ো জা আমাকে বঁটি লইয়া মারিতে আসিয়াছিল, আমি তাহাকে দা লইয়া ঠেকাইতে গিয়া হঠাৎ কেমন করিয়া লাগিয়া গিয়াছে।" এ-সমস্তই রামলোচনের রচিত। ইহার অনুকূলে যে যে অলংকার এবং প্রমাণ-প্রয়োগের আবশ্যক তাহাও সে বিস্তারিতভাবে ছিদামকে শিখাইয়াছিল।

পুলিস আসিয়া তদন্ত করিতে লাগিল। চন্দরাই যে তাহার বড়ো জাকে খুন করিয়াছে গ্রামের সকল লোকের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। সকল সাক্ষীর দ্বারাই সেইরূপ প্রমাণ হইল। পুলিস যখন চন্দরাকে প্রশ্ন করিল, চন্দরা কহিল, "হাঁ, আমি খুন করিয়াছি।"

"কেন খুন করিয়াছ?"

"আমি তাহাকে দেখিতে পারিতাম না।"

"কোনো বচসা হইয়াছিল?"

"না।"

"সে তোমাকে প্রথমে মারিতে আসিয়াছিল?"

"না।"

"তোমার প্রতি কোনো অত্যাচার করিয়াছিল?"

"না।"

এইরূপ উত্তর শুনিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল।

ছিদাম তো একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল। কহিল, "উনি ঠিক কথা বলিতেছেন না। বড়োবউ প্রথমে– "

দারোগা খুব এক তাড়া দিয়া তাহাকে থামাইয়া দিল। অবশেষে তাহাকে বিধিমতে জেরা করিয়া বার বার সেই একই উত্তর পাইল বড়োবউয়ের দিক হইতে কোনোরূপ আক্রমণ চন্দরা কিছুতেই স্বীকার করিল না।

এমন একগুঁয়ে মেয়েও তো দেখা যায় না। একেবারে প্রাণপণে ফাঁসিকাষ্ঠের দিকে ঝুঁকিয়াছে, কিছুতেই তাহাকে টানিয়া রাখা যায় না। এ কী নিদারুণ অভিমান। চন্দরা মনে মনে স্বামীকে বলিতেছে, 'আমি তোমাকে ছাড়িয়া আমার এই নবযৌবন লইয়া ফাঁসিকাঠকে বরণ করিলাম - আমার ইহজন্মের শেষবন্ধন তাহার সহিত।'

বন্দিনী হইয়া চন্দরা, একটি নিরীহ ক্ষুদ্র চঞ্চল কৌতুকপ্রিয় গ্রামবধূ, চির-পরিচিত গ্রামের পথ দিয়া, রথতলা দিয়া, হাটের মধ্য দিয়া, ঘাটের প্রান্ত দিয়া, মজুমদারদের বাড়ির সম্মুখ দিয়া, পোস্টাপিস এবং ইস্কুল ঘরের পার্শ্ব দিয়া, সমস্ত পরিচিত লোকের চরে উপর দিয়া, কলঙ্কের ছাপ লইয়া চিরকালের মতো গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। এক-পাল ছেলে পিছন পিছন চলিল এবং গ্রামের মেয়েরা, তাহার সই-সাঙাতরা কেহ ঘোমটার ফাঁক দিয়া, কেহ দ্বারের প্রান্ত হইতে, কেহ-বা গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া, পুলিস-চালিত চন্দরাকে দেখিয়া লজ্জায় ঘৃণায় ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছেও চন্দরা দোষ স্বীকার করিল। এবং খুনের সময় বড়োবউ যে তাহার প্রতি কোনোরূপ অত্যাচার করিয়াছিল তাহা প্রকাশ হইল না। কিন্তু, সেদিন ছিদাম সাক্ষ্যস্থলে আসিয়াই একেবারে কাঁদিয়া জোড়হস্তে কহিল,"দোহাই হুজুর, আমার স্ত্রীর কোনো দোষ নাই।" হাকিম ধমক দিয়া তাহার উচ্ছ্বাস নিবারণ করিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, সে একে একে সত্য ঘটনা প্রকাশ করিল।

হাকিম তাহার কথা বিশ্বাস করিলেন না। কারণ প্রধান বিশ্বস্ত ভদ্রসাক্ষী রামলোচন কহিল, "খুনের অনতিবিলম্বেই আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলাম। সাক্ষী ছিদাম আমার নিকট সমস্ত স্বীকার করিয়া আমার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, 'বউকে কী করিয়া উদ্ধার করিব আমাকে যুক্তি দিন।' আমি ভালো মন্দ কিছুই বলিলাম না। সাক্ষী আমাকে বলিল, 'আমি যদি বলি, আমার বড়ো ভাই ভাত চাহিয়া ভাত পায় নাই বলিয়া রাগের মাথায় স্ত্রীকে মারিয়াছে, তাহা হইলে সে কি রক্ষা পাইবে।' আমি কহিলাম, 'খবরদার হারামজাদা, আদালতে এক বর্ণও মিথ্যা বলিস না– এতবড়ো মহাপাপ আর নাই!' ইত্যাদি।

রামলোচন প্রথমে চন্দরাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশে অনেকগুলা গল্প বানাইয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু যখন দেখিল চন্দরা নিজে বাঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে তখন ভাবিল, 'ওরে বাপ রে, শেষকালে কি মিথ্যা সাক্ষ্যর দায়ে পড়িব। যেটুকু জানি সেইটুকু বলা ভালো।' এই মনে করিয়া রামলোচন যাহা জানে তাহাই বলিল। বরঞ্চ তাহার চেয়েও কিছু বেশি বলিতে ছাড়িল না।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সেশনে চালান দিলেন।

ইতিমধ্যে চাষবাস হাটবাজার হাসিকান্না পৃথিবীর সমস্ত কাজ চলিতে লাগিল। এবং পূর্ব পূর্ব বৎসরের মতো নবীন ধান্যেক্ষেত্র শ্রাবণের অবিরল বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইতে লাগিল।

পুলিস আসামি এবং সাক্ষী লইয়া আদালতে হাজির। সম্মুখবর্তী মুন্সেফের কোর্টে বিস্তর লোক নিজ নিজ মোকদ্দমার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। রন্ধনশালার পশ্চাদ্বর্তী একটি ডোবার অংশবিভাগ লইয়া কলিকাতা হইতে এক উকিল আসিয়াছে

এবং তদুপলে বাদীর পক্ষে উনচল্লিশজন সাক্ষী উপস্থিত আছে। কত শত লোক আপন আপন কড়াগণ্ডা হিসাবের চুলচেরা মীমাংসা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া আসিয়াছে, জগতে আপাতত তদপেক্ষা গুরুতর আর-কিছুই উপস্থিত নাই এইরূপ তাহাদের ধারণা। ছিদাম বাতায়ন হইতে এই অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত প্রতিদিনের পৃথিবীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে, সমস্তই স্বপ্নের মতো বোধ হইতেছে। কম্পাউন্ডের বৃহৎ বটগাছ হইতে একটি কোকিল ডাকিতেছে - তাহাদের কোনোরূপ আইন-আদালত নাই।

চন্দরা জজের কাছে কহিল, "ওগো সাহেব, এক কথা আর বার বার কত বার করিয়া বলিব।"

জজসাহেব তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "তুমি যে অপরাধ স্বীকার করিতেছ তাহার শাস্তি কী জান?"

চন্দরা কহিল, "না।"

জজসাহেব কহিলেন, "তাহার শাস্তি ফাঁসি।"

চন্দরা কহিল, "ওগো, তোমার পায়ে পড়ি তাই দাও-না, সাহেব। তোমাদের যাহা খুশি করো, আমার তো আর সহ্য হয় না।"

যখন ছিদামকে আদালতে উপস্থিত করিল চন্দরা মুখ ফিরাইল। জজ কহিলেন, "সাক্ষীর দিকে চাহিয়া বলো, এ তোমার কে হয়।"

চন্দরা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কহিল, "ও আমার স্বামী হয়।"

প্রশ্ন হইল, "ও তোমাকে ভালোবাসে না?"

উত্তর। উঃ, ভারি ভালোবাসে।

প্রশ্ন। তুমি উহাকে ভালোবাস না?

উত্তর। খুব ভালোবাসি।

ছিদামকে যখন প্রশ্ন হইল, ছিদাম কহিল, "আমি খুন করিয়াছি।"

প্রশ্ন। কেন।

ছিদাম। ভাত চাহিয়াছিলাম, বড়োবউ ভাত দেয় নাই। দুখিরাম সাক্ষ্য দিতে আসিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িল। মূর্ছাভঙ্গের পর উত্তর করিল, "সাহেব, খুন আমি করিয়াছি।"

"কেন।"

"ভাত চাহিয়াছিলাম, ভাত দেয় নাই।"

বিস্তর জেরা করিয়া এবং অন্যান্য সাক্ষ্য শুনিয়া জজসাহেব স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, ঘরের স্ত্রীলোককে ফাঁসির অপমান হইতে বাঁচাইবার জন্য ইহারা দুই ভাই অপরাধ স্বীকার করিতেছে। কিন্তু, চন্দরা পুলিস হইতে সেশন আদালত পর্যন্ত বরাবর এক কথা বলিয়া আসিতেছে, তাহার কথার তিলমাত্র নড়চড় হয় নাই। দুইজন উকিল স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে প্রাণদণ্ড হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু অবশেষে তাহার নিকট পরাস্ত মানিয়াছে।

যেদিন একরত্তি বয়সে একটি কালোকোলো ছোটোখাটো মেয়ে তাহার গোলগাল মুখটি লইয়া খেলার পুতুল ফেলিয়া বাপের ঘর হইতে শ্বশুরঘরে আসিল সেদিন রাত্রে শুভলগ্নের সময় আজিকার দিনের কথা কে কল্পনা করিতে পারিত। তাহার বাপ মরিবার সময় এই বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল যে, 'যাহা হউক, আমার মেয়েটির একটি সদগতি করিয়া গেলাম।'

জেলখানায় ফাঁসির পূর্বে দয়ালু সিভিল সার্জন চন্দরাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কাহাকেও দেখিতে ইচ্ছা কর?"

চন্দরা কহিল, "একবার আমার মাকে দেখিতে চাই।"

ডাক্তার কহিল, "তোমার স্বামী তোমাকে দেখিতে চায়, তাহাকে কি ডাকিয়া আনিব।"

চন্দরা কহিল "মরণ ! – "

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অলংকার– গহনা, আভরণ, ভূষণ; এখানে যুক্তি অর্থে ব্যবহৃত। **একগুঁয়ে–** জেদি, একরোখা, অবাধ্য। **একরত্তি–** সামান্য পরিমাণ, অতি অল্প। **কড়াগণ্ডা–** পুরোনো দিনের পরিমাপের একক বিশেষ; এখানে চুলচেরা হিসাব অর্থে। **চালান–** পাঠানো, প্রেরণ; এখানে বিচারার্থে প্রেরণ। **জা–** স্বামীর ভাইয়ের স্ত্রী। **জেরা–** সওয়াল, আদালতে সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্য বিপক্ষের উকিলের প্রশ্ন। **বচসা–** ঝগড়া, কলহ। **বাতায়ন–** জানালা, গবাক্ষ। **মূর্ছিত–** লুপ্তচেতনা, অচেতন, জ্ঞানহারা। **সদগতি–** ভালো ব্যবস্থা। **সেশনে–** ফৌজদারি মামলা বিচারের জন্য জজ ও জুরির অধীনে গঠিত আদালতে। **স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত–** নিজ ইচ্ছায় প্রবৃত্ত, নিজের ইচ্ছায় কোনো কাজ করা হয়েছে এমন। **রন্ধনশালা–** রান্নাঘর ।

সারসংক্ষেপ :

আদালতে চন্দরা স্বামীর শিখানো কোনো কথা না বলে খুনের দায় নিজ স্কন্ধে নিয়ে নিল। তার কথা শুনে সবাই অবাক হল। ছিদাম, দুখিরাম নিজেরা খুনের দায় নিয়ে চন্দরাকে বাঁচানোর চেষ্টা করল। কিন্তু বিচারক চন্দরাকেই খুনী হিসেবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফাঁসির আদেশ দিলেন। ছিদাম যে ইচ্ছা করে চন্দরাকে ফাঁসির কাঠে তোলেনি, তা বোঝা যায় তার শেষ আচরণ থেকে। কিন্তু শেষ পর্যন্তও চন্দরা অভিমানে ক্ষোভে নিজের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করে যায়। চন্দরার ফাঁসি হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে মূল শাস্তিটা পেয়েছে ছিদামই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৯. জগতে কাদের কোনোরূপ আইন-আদালত নেই?

ক. পুতুল　　খ. সাক্ষী
গ. আসামি　　ঘ. কোকিল

১০. চন্দরা কেন দোষ স্বীকার করেছিল?

ক. ক্ষোভে　　খ. অভিমানে
গ. অপমানে　　ঘ. হতাশায়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

হায় সাধু, তুমি দেখলে শুধুই বাণিজ্য বায়ু
দেখলে না তুমি এখানে আপন
নারীর হৃদয়ে অন্য তুফান।

১১. উদ্দীপকের নারী ‘শাস্তি’ গল্পে কোন চরিত্রকে ইঙ্গিত করে?

ক. চন্দরা　　খ. বড় বউ
গ. ছিদাম রুই　　ঘ. দুখিরাম রুই

১২. উদ্দীপকের ভাববস্তু যে বাক্যে প্রকাশিত হয়েছে–

ক. ভাত চাহিয়াছিলাম, ভাত দেয় নাই।　　খ. একবার মাকে দেখিতে চাই।
গ. চন্দরা কহিল, ‘মরণ।’　　ঘ. ও আমার স্বামী হয়।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১৩. জেলখানায় চন্দরা কাকে দেখতে চেয়েছিল?

ক. দুখিরাম　　খ. ছিদাম
গ. মা　　ঘ. বাবা

১৪. রামলোচন আদালতে উল্টো কথা বলেছিল কেন?

ক. মিথ্যা সাক্ষ্যের দায়ে পড়ার ভয়ে
খ. দুখিরামের ক্ষতি করতে চায়নি
গ. অর্থ প্রাপ্তির আশায়
ঘ. হাকিমের ধমকের কারণে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১৫ ও ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

তিন ভাই মিলে খেলতে খেলতে হঠাৎ ঝগড়া বেঁধে যায়। অর্ক আর আদিব দুই ভাই মিলে ইচ্ছামতো মেরেছে ফুফাতো ভাই অর্ণবকে। দাদাভাইয়ের কথা মনে পড়তেই অর্ক ও আদিব ভড়কে যায়। দাদাভাই যখন তাদের শাস্তি দেয়ার কথা ভাবছেন তখন দু'ভাই-ই বলে উঠে,"আমি-ই অর্ণবকে মেরেছি।"

১৫. উদ্দীপকের অর্ক ও আদিবের সঙ্গে 'শাস্তি' গল্পে কাদের মিল রয়েছে?

ক. দুখিরাম ও ছিদাম
খ. বড় বউ ও চন্দরা
গ. রামলোচন ও দুখিরাম
ঘ. ছিদাম ও চন্দরা

১৬. উদ্দীপক ও 'শাস্তি' গল্পে দু'ভাইয়ে সাদৃশ্য রয়েছে যে বিষয়ে–

ক. ভালোবাসা
খ. লজ্জা
গ. আত্মমর্যাদা
ঘ. ঘৃণা

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ :

দেখিলাম, এই সতেরো বছরের মেয়েটির উপরে যৌবনের সমস্ত আলো আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু এখনো কৈশোরের কোল হইতে সে জাগিয়া উঠে নাই। ঠিক যেন শৈলচূড়ার বরফের উপর সকালের আলো ঠিকরিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু বরফ এখনো গলিল না। আমি জানি, কী অকলঙ্ক শুভ্র সে, কী নিবিড় পবিত্র!

ক. চন্দরা কাশী মজুমদারের কোন ছেলের ব্যাখ্যা করেছিল?
খ. 'শাস্তি' গল্পে দুই ভাই-ই কেন অপরাধ স্বীকার করতে চেয়েছে?
গ. উদ্দীপকে ফুটে উঠা বয়সের দিকটি 'শাস্তি' গল্পের কোন চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে?
ঘ. "উদ্দীপকে নারীর জাগরণ ঘটেনি, কিন্তু 'শাস্তি' গল্পে চন্দরার ব্যক্তিত্বের জাগরণ ঘটেছে।" –বিশ্লেষণ করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন-১

ক.

চন্দরা পাড়া পর্যটন করে বাড়ি এসে কাশী মজুমদারের মেজো ছেলের ব্যাখ্যা করত।

খ.

'শাস্তি' গল্পে ঘরের স্ত্রীলোককে ফাঁসির অপমান হতে বাঁচাবার জন্য দুই ভাই-ই অপরাধ স্বীকার করতে চেয়েছে।

দুখিরামের দা'য়ের আঘাতে বড় বউ মারা যায়। কিন্তু ছিদাম তার স্ত্রী চন্দরাকে বলে এই অপরাধের দায় নিজের কাঁধে নিতে। চন্দরাও স্বামীর প্রতি অভিমান করে আদালতে হত্যার দায় স্বীকার করে। ফলে বিচারে তার ফাঁসির রায় হয়ে যায়। ঘরের স্ত্রীলোকের ফাঁসি হলে অপমান হবে। তাই দুই ভাই-ই এই অপমান হতে রক্ষা পেতে নিজেরাই অপরাধের দায় স্বীকার করে।

গ.

উদ্দীপকে ফুটে উঠা বয়সের দিকটি 'শাস্তি' গল্পের চন্দরা চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে।

সমকালীন ভারতীয় হিন্দু সমাজে অল্প বয়সে বিয়ের রীতি প্রচলিত ছিল। এ বয়সে মেয়েদের উপরে যৌবনের সমস্ত আলো এসে পড়ে, কিন্তু কৈশোরের কোল হতে সে জেগে উঠে না। এ সময়ে পৃথিবীর সকল বিষয়ে তার একটা কৌতুক ও কৌতূহল থাকে। এ জীবনটা যেন পাহাড় চূড়ায় অবস্থিত অগলিত বরফের মতো।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে সতেরো বছরের মেয়েটির ওপরে যৌবনের সমস্ত আলো এসে পড়েছে। বয়সের দিক থেকে পরিপূর্ণরূপে না হলেও দৈহিক গড়নের দিক থেকে সে যৌবনপ্রাপ্ত হয়েছে। আবার নবীন বয়সের ছাপও রয়েছে তার চেহারায়। ফলে মনে হয় সে কৈশোরের কোল হতে জেগে উঠেনি। 'শাস্তি' গল্পে চন্দরাও নবীন যুবতী। তার বয়স সতেরো

কিংবা আঠারো বছরের অধিক হবে না। সেও উদ্দীপকের মেয়েটির মতোই যৌবনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে। গল্পের বর্ণনা অনুযায়ী চন্দরা খেলার পুতুল ফেলে বাপের বাড়ি হতে শ্বশুরঘরে এসেছিল। তার গতি সহজ, দীপ্তি নির্মল, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে একটি সৌষ্ঠব আছে, শুচিতা অপূর্ব। অর্থাৎ উদ্দীপকের মেয়েটি ও 'শাস্তি' গল্পের চন্দরা দুজনেই নবযৌবনপ্রাপ্ত নারী কিন্তু কিশোরীসুলভ বৈশিষ্ট্য এখনো তাদের মধ্যে রয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের বয়সের বিষয়টি এভাবেই 'শাস্তি' গল্পের চন্দরার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক হয়েছে।

ঘ.

উদ্দীপকে দেহে-মনে যৌবনের কথা বলা হয়েছে, যার বিপরীতে 'শাস্তি' গল্পে চন্দরার ব্যক্তিসত্তার জাগরণের কথা প্রকাশিত হয়েছে।

'শাস্তি' গল্পে ছিদামের স্ত্রী হিসাবে যে চন্দরার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় সে কৈশোর উত্তীর্ণ সতেরো-আঠারো বৎসরের এক যুবতী। অর্থাৎ কৈশোরের কোল হতে তখনো সে জেগে উঠেনি। কিন্তু গল্পের শেষাংশে তার মানসিক জাগরণের স্বরূপ চিত্রিত হয়েছে, যেখানে তার পরিণত ব্যক্তিসত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে সতেরো বছরের মেয়েটি এখনো কৈশোরের কোল থেকে জেগে উঠেনি। 'শাস্তি' গল্পেও দেখা যায়, চন্দরার দেহ-মনেও উদ্দীপকের চরিত্রটির মত অনুরূপ কিশোরীসুলভ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। তবে এ গল্পে চন্দরার ব্যক্তিসত্তার যে জাগরণ ঘটেছে, উদ্দীপকে তা প্রকাশ পায়নি। গল্পের শেষাংশে চন্দরাকে পাওয়া যায় ব্যক্তিত্বময়ী, দৃঢ়চেতা ও সুদৃঢ় লক্ষ্যের অনুসারী এক নারী হিসাবে। সংসার জীবনে পৌঁছেই তাকে আঘাত পেতে হয়েছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের হীন মানসিকতার কাছে। সে তার স্বামীর এমন এক পরিচয় পেয়েছে যাতে প্রমাণিত হয় তার ব্যক্তিসত্তা বলে কিছু নেই। ফলে নারী হত্যার মতো জঘন্য অপরাধের গ্লানি বয়ে বেড়াতে হয়েছে চন্দরাকে। এ আঘাতকে মানসিক শক্তিতে রূপান্তরিত করেছে চন্দরা। সিদ্ধান্ত নিয়েছে আদালতের রায়কে মেনে নিয়ে সে তার আত্মমর্যাদার বিজয় নিশান উড়াবে। এটাই তার মানসিক জাগরণের স্বরূপ।

উদ্দীপকে কেবল নারীর বাহ্যিক গড়নের বর্ণনা করা হয়েছে, আত্মিক জাগরণের কথা বলা হয়নি। অন্যদিকে 'শাস্তি' গল্পে ঘটেছে চন্দরার মানসিক জাগরণ, যা তাকে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণে দৃঢ়চেতা নারী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ জাগরণই চন্দরার ব্যক্তিসত্তার জাগরণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে নারীর জাগরণ ঘটেনি, কিন্তু 'শাস্তি' গল্পে ব্যক্তিত্বের জাগরণ বিশেষ তাৎপর্যবহ।

অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিলাসী' ন্যাড়া নামের এক যুবকের জবানীতে রচিত একটি ছোটগল্প। বিলাসী গল্পে বর্ণিত হয়েছে দুই ব্যতিক্রমধর্মী মানব-মানবীর অসাধারণ প্রেমের মহিমা। যা ছাপিয়ে উঠেছে জাতিগত বিভেদের সংকীর্ণ সীমাকে। গল্পের প্রধান চরিত্র কর্মনিপুণ, বুদ্ধিমতী ও সেবাব্রতী বিলাসী বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল নায়িকা। যে প্রেমের জন্য নির্দ্বিধায় বেছে নিয়েছে স্বেছামৃত্যুর পথ আর তাঁর প্রেমের মহিমাময় আলোয় ধরা পড়েছে সমাজ জীবনের নিষ্ঠুর ও অশুভ চেহারা।

ক. দুখিরাম সমস্ত কাজে কার উপর নির্ভর করে?

খ. 'তাহা হইলে তো হাড় জুড়ায়।' –উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন।

গ. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'শাস্তি' গল্পের কোন ঘটনাকে প্রতিফলিত করে? –আলোচনা করুন।

ঘ. "বিলাসী ও চন্দরা একই ধরনের পরিণতির শিকার হলেও মূলত দু'জন দুই মেরুর বাসিন্দা।" –উদ্দীপক ও 'শাস্তি' গল্পের আলোকে মন্তব্যটি বিচার করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গ ২. ক ৩. ক ৪. ক ৫. ক ৬. ক ৭. খ ৮. ক ৯. ঘ ১০. খ ১১. ক ১২. গ
১৩. গ ১৪. ক ১৫. ক ১৬. ক

হুজুর কেবলা

আবুল মনসুর আহমদ

ভূমিকা

আবুল মনসুর আহমদের *আয়না* (১৯৩৫) গল্প-সংকলন থেকে 'হুজুর কেবলা' গল্পটি সংকলিত হয়েছে। 'হুজুর কেবলা' গল্প প্রথম প্রকাশিত হয় *সাওগাত* পত্রিকায়। *আয়না* গ্রন্থভুক্ত গল্পগুলো সম্পর্কে আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন– "গল্পগুলোর রচনাকাল ১৯২২ থেকে ১৯২৯ সালের মধ্যে এবং এগুলোর অধিকাংশই *সাওগাত* পত্রিকায় প্রকাশিত। ১৯২৬ হইতে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত চার বছর কাল আমি 'সওগাতের সম্পাদকের দফতর' লেখায় সাহায্য করি। ঐ সাথেই আমার '*আয়না*'র গল্পগুলিও সওগাতে বাহির হয়।" কাজেই বোঝা যায়, উনিশশ' বিশের দশকেই 'হুজুর কেবলা' গল্প রচিত এবং প্রকাশিত। 'হুজুর কেবলা' গল্পে বাংলাদেশের গ্রামজীবনে প্রবলভাবে গেঁড়ে বসা পীর ব্যবসার বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। এক ভণ্ড পীর, পীরের কতিপয় সাগরেদ, তাদের ভণ্ডামি ও মিথ্যাচার, পীরের রিরংসাবৃত্তি চরিতার্থ করার কৌশল এবং এক প্রতিবাদী যুবকের আখ্যান শিল্পিত হয়েছে আলোচ্য গল্পে।

সাধারণ উদ্দেশ্য

আবুল মনসুর আহমদের 'হুজুর কেবলা' গল্পটি পাঠ করে আপনি–

- ছোটগল্প হিসেবে 'হুজুর কেবলা'র সার্থকতা বিচার করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনে বক-ধার্মিকদের ভণ্ডামি এবং ধর্ম ব্যবসা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- 'হুজুর কেবলা'র চরিত্র বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- প্রতিবাদী যুবক এমদাদ সম্পর্কে আলোচনা লিখতে পারবেন।
- ব্যঙ্গ সাহিত্য রচনায় আবুল মনসুর আহমদের কৃতিত্ব বর্ণনা করতে পারবেন ।

পাঠ–১

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- এমদাদের অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান ও তা থেকে খেলাফৎ আন্দোলনে আসার কারণ লিখতে পারবেন।
- হুজুর কেবলার প্রতি এমদাদের আকর্ষণের কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- পীর সাহেবের চরিত্রের কতিপয় বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবেন ।
- পীরের মুরিদ হবার জন্য এমদাদের আগ্রহের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

এমদাদ তার সবগুলো বিলাতি ফিনফিনে ধুতি, সিল্কের জামা পোড়াইয়া ফেলিল; ফ্লেক্সের ব্রাউন রঙের পাম্পশুগুলো বাবুর্চিখানার বঁটি দিয়া কোপাইয়া ইলিশ-কাটা করিল। চশমা ও রিস্টওয়াচ মাটিতে আছড়াইয়া ভাঙিয়া ফেলিল; ক্ষুর, স্ট্রপ, শেভিংস্টিক ও ব্রাশ অনেকখানি রাস্তা হাঁটিয়া নদীতে ফেলিয়া দিয়া আসিল; বিলাসিতার মস্তকে কঠোর পদাঘাত করিয়া পাথর বসানো সোনার আংটিটা এক অন্ধ ভিক্ষুককে দান করিয়া এবং টুথক্রীম ও টুথব্রাশ পায়খানার টবের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া কয়লা দিয়া দাঁত ঘষিতে লাগিল।

অর্থাৎ এমদাদ অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিল! সে কলেজ ছাড়িয়া দিল।

তারপর সে কোরা খদ্দরের কল্লিদার কোর্তা ও সাদা লুঙ্গি পরিয়া মুখে দেড় ইঞ্চি পরিমাণ ঝাঁকড়া দাড়ি লইয়া সামনে-পিছনে সমান-করিয়া-চুল-কাটা মাথায় গোল নেকড়ার মতো টুপি কান পর্যন্ত পরিয়া চটিজুতা পায়ে দিয়া যেদিন বাড়িমুখে রওনা হইল, সেদিন রাস্তার বহুলোক তাকে সালাম দিল।

সে মনে মনে বুঝিল, কলিযুগেও দুনিয়ার ধর্ম আছে।

কলেজে এমদাদের দর্শনে অনার্স ছিল।

কাজেই সে ধর্ম, খোদা, রসুল কিছুই মানিত না। সে খোদার আরশ, ফেরেশতা, ওহী, হযরতের মেরাজ লইয়া সর্বদা হাসিঠাট্টা করিত।

কলেজ ম্যাগাজিনে সে মিল, হিউম, স্পেন্সার, কোমতের ভাব চুরি করিয়া অনেকবার খোদার অস্তিত্বের অসারত্ব প্রমাণ করিয়াছিল।

কিন্তু খেলাফৎ আন্দোলনে যোগদান করিয়া এমদাদ একেবারে বদলাইয়া গেল।

সে ভয়ানক নামায পড়িতে লাগিল। বিশেষ করিয়া নফল নামাযে সে একেবারে তন্ময় হইয়া পড়িল।

গোল-গাল করিয়া বাঁশের কঞ্চি কাটিয়া সে নিজ হাতে একছড়া তসবিহ তৈরি করিল। সেই তসবির উপর দিয়া অষ্টপ্রহর অঙ্গুলি চালনা করিয়া সে দুইটা আঙ্গুলের মাথা ছিঁড়িয়া ফেলিল।

কিন্তু এমদাদ টলিল না। সে নিজের নধর দেহের দিকে চাহিয়া বলিল : হে দেহ, তুমি আমার আত্মাকে ছোট করিয়া নিজেই বড় হইতে চাহিয়াছিলে! কিন্তু আর নয়।

সে আবার দ্বিগুণ উৎসাহে তসবিহ চালাইতে লাগিল।

দুই.

দিন যাইতে লাগিল।

ক্রমে এমদাদ একটা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। বহু চেষ্টা করিয়াও সে এবাদতে তেমন নিষ্ঠা আনিতে পারিতেছিল না। নিজেকে বহু শাসাইল, বহু প্রক্রিয়া অবলম্বন করিল; কিন্তু তথাপি পোড়া ঘুম তাকে তাহাজ্জতের নামায তরফ করিতে বাধ্য করিতে ছিল।

অগত্যা সে নামাযে বসিয়া খোদার নিকট হাত তুলিয়া কাঁদিবার বহু চেষ্টা করিল। চোখের পানির অপেক্ষায় আগে হইতে কান্নার মতো মুখ বিকৃত করিয়া রাখিল। কিন্তু পোড়া চোখের পানি কোন মতেই আসিল না।

সে স্থানীয় কংগ্রেস ও খেলাফৎ কমিটি সেক্রেটারি ছিল।

সেখানে প্রত্যহ সকালে-বিকালে চারিপাশের বহু মওলানা মৌলবি সমবেত হইয়া কাবুলের আমিরের ভারত আক্রমণের কতদিন বাকি আছে তার হিসাব করিতেন এবং খেলাফৎ নোট-বিক্রয়-লব্ধ পয়সায় প্রত্যহ পান ও যরদা এবং সময়-সময় নাশতা খাইতেন।

ইহাদের একজন সুফি বলে খ্যাতি ছিল। তিনি এক পীর সাহেবের স্থানীয় খলিফা ছিলেন এবং অনেক রাত পর্যন্ত 'এলহু' 'এলহু' করিতেন।

অল্পদিন পূর্বে 'এস্তেখারা' করিয়া তিনি দেখিয়াছিলেন যে, চারি বৎসরের মধ্যে কাবুলের আমির হিন্দুস্থান দখল করিবেন।

তাহার কথাই সকলেই বিশ্বাস করিয়াছিলেন; কারণ মেয়েলোকের উপর জিনের আসর হইলে তিনি ছাড়াইতে পারিতেন।

এই সুফি সাহেবের নিকট এমদাদ তার প্রাণের কথা জানাইল।

সুফি সাহেব দাড়িতে বুলাইয়া মৃদু হাসিয়া ইংরাজি-শিক্ষিতদের উদ্দেশ্য করিয়া অনেক বাঁকা বাঁকা কথা বলিয়া উপসংহারে বলিলেন : হকিকতান্ যদি আপনি রুহের তরক্কি হাসিল করিতে চান, তবে আপনাকে আমার কথা রাখিতে হইবে। আচ্ছা, মাস্টার সাহেব, আপনি কার মুরিদ?

এমদাদ অপ্রতিভভাবে বলিল : আমি তো কারো মুরিদ হই নাই।

সুফি সাহেব যেন রোগ নির্ণয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন এইভাবে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন : হ-ম, তাই বলুন। গোড়াতেই গলৎ। পীর না ধরিয়া কি কেহ রুহানিয়াৎ হাসিল করিতে পারে? হাদিস শরীফে আসিয়াছে : (এই খানে সুফি সাহেব বিশুদ্ধরূপে আইন-গাইনের উচ্চারণ করিয়া কিছু আরবী আবৃত্তি করিলেন এবং উর্দুতে তার মানে–মতলব বয়ান করিয়া অবশেষে বাংলায় বলিলেন :) জয্বা ও সলুক খতম করিয়া ফানা ও বাকা লাভে সমর্থ হইয়াছেন এরূপ কামেল ও মোকাম্মেল, সালেক ও মজযুব পীরের দামন না ধরিয়া কেহ জমিরের রওশনী ও রূহের তরক্কী হাসিল করিতে পারে না।

হাদিসের এই সুস্পষ্ট নির্দেশের কথা শুনিয়া এমদাদ নিতান্ত ঘাবড়াইয়া গেল। সে ধরা-গলায় বলিল : কি হইবে আমার তাহা হইলে সুফী সাহেব?

সুফী সাহেব এমদাদের কাঁধে হাত রাখিয়া বলিলেন : ঘাবড়াইবার কোন কারণ নাই। কামেল পীরের কাছে গেলে একদিনে তিনি সব ঠিক করিয়া দিবেন।

স্বস্তিতে এমদাদের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

সে আগ্রহাতিশয্যে সুফী সাহেবের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল : কোথায় পাইব কামেল পীর? আপনার সন্ধানে আছে?

উত্তরে সুফী সাহেব সুর করিয়া একটি ফারসী বয়েত আবৃত্তি করিয়া তার অর্থ বলিলেন : জওহরের তালাসে যারা জীবন কাটাইয়াছে, তারা ব্যতীত আর কে জওহরের খবর দিতে পারে? হাজার শোকর খোদার দরগায়, বহু তালাশের পর তিনি জওহরের খবর দিতে পারেন? হাজার শোকর খোদার দরগায়, বহু তালাশের পর তিনি জওহর মিলাইয়াছেন।

সুফী সাহেবের হাত তখনও এমদাদের মুঠার মধ্যে ছিল। সে তা আরো জোরে চাপিয়া ধরিয়া বলিলো : আমাকে লইয়া যাইবে না সেখানে?

সুফী সাহেব বলিলেন : কেন লইয়া যাইব না? হাদিস শরিফে আসিয়াছে : (আরবি ও উর্দু) যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় আসিতে চায়, তার সাহায্য কর।

সংসারে একমাত্র বন্ধন এবং অভিভাবক বৃদ্ধা ফুফুকে কাঁদাইয়া একদিন এমদাদ সুফী সাহেবের সঙ্গে পীর-জিয়ারতে বাহির হইয়া পড়িল।

তিন.

এমদাদ দেখিল : পীর সাহেবের একতলা পাকা বাড়ি। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। অন্দরবাড়ির সব ক'খানা ঘর পাকা হইলেও বৈঠকখানাটি অতি পরিপাটি প্রকাণ্ড খড়ের আটচালা।

সে সুফী সাহেবের পিছনে পিছনে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। দেখিল : ঘরে বহু লোক জানু পাতিয়া বসিয়া আছেন। বৈঠকখানার মাঝখানে দেওয়াল ঘেঁষিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চ আসনে মেহেদি-রঞ্জিত দাঁড়ি বিশিষ্ট একজন বৃদ্ধ লোক তাকিয়া হেলান দিয়া আলবোলায় তামাক টানিতেছেন।

এমদাদ বুঝিল : ইনিই পীর সাহেব।

'আসসালামু আলাইকুম' বলিয়া সুফী সাহেব সোজা পীর সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া হাঁটু পাতিয়া বসিলেন। পীর সাহেব সম্মুখস্থ তাকিয়ার উপর একটি পা তুলিয়া দিলেন। সুফী সাহেব সেই পায়ে হাত ঘঁষিয়া নিজের চোখে মুখে ও বুকে লাগাইলেন।

তৎপর পীর সাহেব তাঁর হাত বাড়াইয়া দিলেন। সুফী সাহেব তা চুম্বন করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং পিছাইয়া-পিছাইয়া কিছু দূর গিয়া অন্যান্য সকলের ন্যায় জানু পাতিয়া বসিলেন।

পীর সাহেব এতক্ষনে কথা বলিলেন : কিরে বেটা, খবর কী? তুই কি এরই মধ্যে দায়েবায়ে হকিকতে মহব্বত ও জযবায়ে-যাতী-বনাম হোব্বে এশক হাসেল করিয়া ফেলিলি নাকি?

পীর সাহেবের এই ঠাট্টায় লজ্জা পাইয়া সুফী সাহেব মাথা নিচু করিয়া মাজা ঈষৎ উঁচু করিয়া বলিলেন; হযরত, বান্দাকে লজ্জা দিতেছেন!

পীর সাহেব তেমনি হাসিয়া বলিলেন : তা না হইলে নিজের চিন্তা ছাড়িয়া অপরের রুহের সুপারিশ করিতে আমার নিকট আসিলেন কেন? কই তোর সঙ্গী কোথায়? আহা! বেচারা বড়ই অশান্তিতে দিনপাত করিতেছে।

এই বলিয়া পীর সাহেব চক্ষু বুজিলেন এবং প্রায় এক মিনিট কাল ধ্যানস্থ থাকিয়া চক্ষু মেলিয়া বলিলেন : সে এই ঘরেই হাযের আছে দেখিতেছি।

উপস্থিত মুরিদগণের সকলে বিস্ময়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগল। এমদাদ ভক্তি ও বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া একদৃষ্টে পীর সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া রইলেন। মেহেদি-রঞ্জিত দাড়ি গোঁফের ভিতর দিয়া পীর সাহেবের মুখ হইতে এক প্রকার জ্যোতি বিকীর্ণ হইতে লাগিল।

সুফী সাহেব এমদাদকে আগাইয়া আসিতে ইশারা করিলেন। সে ধীরে ধীরে পীর সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সুফী সাহেবের ইঙ্গিতে অনভ্যস্ত হাতে কদম-বুসি করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পীর সাহেব "বস বেটা, তোর ভাল হইবে। আহা, বড় গরীব!" বলিয়া আলবেলার নলে দম কষিলেন।

সুফী সাহেব আমতা-আমতা করিয়া বলিলেন : হযরত এর অবস্থা তত গরীব নয়। বেশ ভাল তালুক সম্পত্তি–

পীর সাহেব নলে খুব লম্বা টান কষিয়াছিলেন; কিন্তু মধ্যপথে দম ছাড়িয়া দিয়া মুখে ধোঁয়া লইয়াই বলিলেন : বেটা, তোরা আজিও দুনিয়ার ধন-দওলত দিয়া ধনী-গরীব বিচার করিস। এটা তোদের বুঝিবার ভুল। আমি গরীব কথায় দুনীয়াবী গোরবৎ বুঝাই নাই। মুসলমানদের জন্য দুনিয়ার ধন-দওলত হারাম। এই ধন-দওলত এনসানের রুহানিয়ত হাসেলে বাধা জন্মায়, তার মধ্যে নফসানিয়ত পয়দা করে। আল্লাহতালা বলিয়াছেন : (আরবি ও উর্দু) বেশক দুনিয়ার ধন-দওলত শয়তানের ওয়াস-ওয়াসা, ইহা হইতে দূরে পলায়ন কর। কিন্তু দুনিয়ার মায়া কাটান কি সহজ কথা? তোদের আমি দোষ দেই না তোদের অনেকেই এখন যেকেরের দরজাই পড়িয়া আছিস। যেকরে জলী ও যেকরে খফী–এই দুই দরজার যেকের সারিয়া পরে ফেকেরের দরজায় পঁহুছিতে হয়। ফেকের হইতে যহুর এবং যহুর হইতে মোরাকেবা-মোশহেদার কালিয়ত হাসিল হয়। খোদার ফজলে আমি আরেফিন, সালেহীন ও সিদ্দিকিনের মোকামাতের বিভিন্ন দায়েরার ভিতর দিয়া যেভাবে এলমে-লাদুন্নির ফয়েজ হাসেল করিয়াছি, তোদের কলব অতটা কুশাদা হইতে অনেক দেরি–অনেক–

–বলিয়া তিনি হুক্কার নলটা ছাড়িয়া দিয়া সোজা হইয়া বসিলেন এবং চোখ বুজিয়া ধ্যানস্থ হইলেন।

কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়া থাকিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং চিৎকার করিয়া বলিলেন : কুদরতে-ইযদানী।

মুরিদরা সব সে-চিৎকারে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু কেহ কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলেন না।

পীর সাহেব চিৎকার করিয়াই আবার চোখ বুজিয়াছিলেন। তিনি এবার ঈষৎ হাসিয়া চোখ মেলিয়া বলিলেন : আমরা কত বৎসর হইল এখানে বসিয়া আছি? জনৈক মুরিদ বলিলেন : হযরত, বৎসর কোথায়? এই না কয়েক ঘণ্টা হইল।

পীর সাহেব হাসিলেন। বলিলেন : অনেক দেরি–অনেক দেরি। আহা বেচারারা চোখের বাহির আর কিছুই দেখিতে পায় না।

অপর মুরিদ বলিলেন : হুজুর কেবলা, আপনার কথা মোটেই বুঝিতে পারিলাম না।

পীর সাহেব মৃদু হাসিয়া বলিলেন : অত সহজে কি আর সব কথা বুঝা যায় তো বেটা? চেষ্টা কর, চেষ্টা কর।

মুরিদটি ছিলেন একটু আবদেরে রকমের। তিনি বায়না ধরিলেন : না কেবলা, আমাদিগকে বলিতেই হইবে। কেন আপনি বৎসরের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন?

পীর সাহেব বলিলেন : ও-কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিস না। তার চেয়ে অন্য কথা শোন। এই যে সাদুল্লাহ (সুফী সাহেবের নাম) একটি ছেলেকে আমার নিকট মুরিদ করিতে লইয়া আসিল, আমি সে-কথা কি করিয়া জানিতে পারিলাম? আজ তোমরা তাজ্জব হইতেছ। কিন্তু ইনশাআল্লাহ্, যখন তোমরা মোরাকেবায়ে-নেসবতে বায়ন্নাসে তালিম লইবে, তখন অপরের নেসবত সম্বন্ধে তোমাদের কলব আয়নার মতো রওশন হইয়া যাইবে। আল্‌গরয ইহাও খোদার এক শানে-আযিম। সাদুল্লাহ যখন আমার দস্ত-বুসি করে, তখন তার মুখের দিকে আমার নজর পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার রুহ সাদুল্লাহ্‌র রুহের দিকে মোতাওয়াজ্জাহা হইয়া গেল। সেখানে আমি দেখলাম, সাদুল্লাহ্‌র রুহ আর একটা নূতন রুহের সঙ্গে আলাপ করিতেছে। উহাতেই আমি বুঝিয়া লইলাম। আল্লাহু আযিমুশ্ শান।

বলিয়া পীর সাহেব একজন মুরিদকে হুক্কার দিকে ইঙ্গিত করিলেন।

মুরিদ হুক্কার মাথা হাত চিলিম লইয়া তামাক সাজিতে বাহির হইয়া গেল।

পীর সাহেব বলিলেন : তোমরা আমার নিজের নুৎফার ছেলের মতো। তথাপি তোদের নিকট হইতে আমাকে অনেক গায়েবের কথা গোপন রাখিতে হয়। কারণ তোমলা সে-সমস্ত বাতেনী কথা বরদাশত করিতে পারিবে না। যেকের ও ফেকের দ্বারা কলব কুশাদা করিবার আগেই কোনও বড় রকমের নূরে তজল্লী তাতে ঢালিয়া দিলে তাতে কলব অনেক সময় ফাটিয়া যায়। এলমে-লাদুন্নি হাসিল করিবার আগেই আমি একবার লওহে-মাওফুজে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তখন আমি মাত্র দায়েরায়ে-হকিকতে-লাতা আইউনে তালিম লইতেছিলাম। সায়েরে-নাযাবীর ফয়েয তখনও আমার হাসেল হয় নাই। কাজেই আরশে-মওয়াল্লার পরদা আমার চোখের সামনে হইতে উঠিয়া যাইতেই আমি নূরে ইযদানী দেখিয়া বেহুঁশ হইয়া পড়িলাম। তারপর আমর জেসমের মধ্যে আমার রূহের সন্ধান না পাইয়া আমার মুর্শেদ-কেবল–তোরা তো জানিস আমার ওয়ালেদ সাহেবই আমার মুর্শেদ–লওহে মাহফুজ হইতে আমার রূহ আনিয়া আমার জেসমের মধ্যে ভরিয়া দেন, এবং নিজের দায়রার বাহিরে যাওয়ার জন্য আমাকে বহুৎ তম্বিহ করেন। কাজেই দেখিতেছিস, কবেলিওত হাসিল না করিয়া কোন কাজে হাত দিতে নাই। খানিকক্ষণ আগে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম : আমরা কত বৎসর যাবৎ এখানে বসিয়া আছি শুনিয়া তোরা অবাক হইয়াছিলি। কিন্তু এর মধ্যে যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তা শুনিলে তো আরো তাজ্জব হইয়া যাইবি। সে জন্যই সে-কথা বলিতে চাই নাই। কিন্তু কিছু কিছু না বলিলে তোরা শিখবি কোথা হইতে? তাই সে কথা বলাই উচিত মনে করিতেছি। সাদুল্লাহ এখানে আসিবার পর আমি আমার রুহকে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। সে তামাম দুনিয়া ঘুরিয়া সাত হাজার বৎসরে কত বাদশাহ ওফাত করিয়াছে, কত সুলতানাৎ মেসমার হইয়াছে, কত লড়াই হইয়াছে; সব আমার সাফ-সাফ মনে আছে। সেরেফে এইটুকুই বলিলাম; ইহার বেশি শুনিলে তোদের কলব ফাটিয়া যাইবে।

ইতিমধ্যে তামাক আসিয়াছিল।

পীর সাহেব নল হাতে লইয়া ধীরে ধীরে টানিতে লাগিলেন।

সভা নিস্তব্ধ রহিল। কলব ফাটিয়া যাইবার ভয়ে কেহ কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

এমদাদ পীর সাহেবের কথা কান পাতিয়া শুনিতেছিল। কৌতূহল ও বিস্ময়ে সে অস্থিরতা বোধ করিতে লাগিল।

সে স্থির করিল, ইহার কছে মুরিদ হইবে।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অসারত্ব– মিথ্যা, ভ্রান্তি, সারহীনতা। **অষ্টপ্রহর–** আট প্রহর; প্রতি তিন ঘন্টায় এক প্রহর- সে হিসেবে ২৪ ঘন্টায় আট প্রহর। **আরশ–** সর্বব্যাপী আল্লাহর আসন, উচ্চতম স্বর্গীয় অবস্থান। **ওহী–** ঐশী বাণী, আল্লাহর প্রেরিত বাণী। **কদম-বুসি–** পদচুম্বন, পায়ে হাত দিয়ে সালাম করা। **কলব–** হৃদয়, মন। **কলিযুগ–** ভারতীয় পুরাণ মতে চতুর্থ বা শেষ যুগ, চরম দুর্নীতির বা অধর্মের যুগ। **কামেল–** সিদ্ধ, পূর্ণাঙ্গ, নিষ্কলঙ্ক। **কোমতে–** অগাস্ট কোঁত (১৭৯৮-১৮৫৭), বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী। সমাজবিজ্ঞানের জনক হিসেবে পরিচিত। **কোর্তা–** জামা, গাত্রাবরণ। **জওহর–** মণি, রত্ন, মূল্যবান প্রস্তর বিশেষ। **তরক্কি–** উন্নতি। **তসবিহ–** আল্লাহর নাম বা দোয়া-দরূদ পাঠের সময় নির্দিষ্ট সংখ্যা গণনার জন্য দানা বা গুটির মালাবিশেষ। **তাহাজ্জত–** রাত্রির নফল নামাজ। **দরগা–** দরবেশ বা আধ্যাত্মিক ব্যক্তির কবর বা মাজার। **বয়েত–** শিষ্যত্ব গ্রহণ, মুরিদ হওয়া। **বান্দা–** গোলাম, দাস, একান্ত অনুগত ব্যক্তি। **বাবুর্চিখানা–** রান্নাঘর। **মিল–** জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৩), ব্রিটিশ দার্শনিক ও রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ। **মুর্শেদ–** আধ্যাত্মিক গুরু, পীর, পথ-প্রদর্শক। **মেসমার–** সর্বনাশ, চূর্ণ-বিচূর্ণ, সম্পূর্ণ ধ্বংস। **রিস্টওয়াচ–** হাত ঘড়ি। **রুহানিয়াৎ–** আধ্যাত্মিক জ্ঞান, আত্মিক উপলব্ধি। **শোকর–** কৃতজ্ঞতা, প্রশংসা। **সুফি–** মরমি মুসলিম-সাধক, ধার্মিক। **সুলতানাৎ–** বাদশাহি, রাজস্ব। **স্পেন্সার–** হার্বার্ট স্পেন্সার (১৮২০-১৯০৩), বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ও দার্শনিক। **হাসিল–** আদায়, অর্জন, বুদ্ধি ও কৌশলপূর্বক কার্য উদ্ধার। **হিউম–** ডেভিড হিউম (১৭১১-১৭৭৬), স্কটল্যাণ্ডের দার্শনিক-ইতিহাসবিদ।

সারসংক্ষেপ :

দর্শনের ছাত্র এমদাদ হঠাৎ করেই যোগ দেয় অসহযোগ আন্দোলনে। কলেজ জীবনে এমদাদ ছিল আধুনিক জীবনচেতনায় উদ্বুদ্ধ। এমদাদ পাঠ করত মিল, হিউম, স্পেন্সার, কোঁতের রচনা। এ কারণেই ধর্মীয় কোনো বিষয়ে তার বিশ্বাস ছিল না। আল্লাহ, রসুল, খোদার আরশ, ওহি, হযরতের মেরাজ-এর কোনো কিছুই সে বিশ্বাস করত না।

এমদাদের কাছে এর সবকিছুই অলীক ও অসত্য– এ কারণে এসব বিষয় নিয়ে সে প্রায়ই হাসি-তামাসা করত। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের পর এমদাদ আমূল পাল্টে গেল। নামাজ আদায় করা, তজবি জপ করা এসব কাজ সে পালন করতে লাগল নিষ্ঠার সঙ্গে। বাঁশের কঞ্চি দিয়ে বানানো তসবির কারণে তার আঙ্গুলে ক্ষত সৃষ্টি হল, তবু সে ক্ষান্ত হল না। এ সময় সে সন্ধান পায় এক সুফির। সুফি সাহেব এমদাদের সমস্যা বুঝতে পারলেন। তিনি এমদাদকে পীরের মুরিদ হতে বললেন। সংসারের একমাত্র বন্ধন ফুফুকে কাঁদিয়ে সুফি সাহেবের সঙ্গে এমদাদ পীরের বাড়িতে চলে গেল। পীর, যিনি এই গল্পের হুজুর কেবলা, নানা উপায়ে কৌশলে এমদাদকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করলেন। পীরের আচরণ, ক্রিয়াকলাপ ও কল্পকাহিনি এমদাদকে বিস্ময়াভিভূত করে রাখে। এমদাদ হুজুর কেবলার মুরিদ হবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. এমদাদ কোন বিষয়ে অনার্স পড়ত?

ক. ইংরেজি খ. দর্শন
গ. আরবি গ. উর্দু

২. 'কলিযুগ' বলতে বোঝানো হয়েছে–

i. সমস্যা ও সংকটাপন্ন বর্তমান সময়কে
ii. নদী-পারের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যকে
iii. সুখী ও সমৃদ্ধ অতীত কালকে

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i ও ii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

ধলপুর গ্রামে একজন সাধকের আগমন ঘটেছে। তিনি নাকি ঝড়বৃষ্টি থামাতে পারেন। নদীর ওপর দিয়ে হাঁটতে পারেন। চাঁদকে হাতের মুঠোয় পুরতে পারেন।

৩. উদ্দীপকের সাধক 'হুজুর কেবলা' গল্পে কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে?

ক. এমদাদ খ. পীর সাহেব
গ. সুফি সাহেব ঘ. রজব

৪. এরূপ সাদৃশ্য পাওয়া যায় যে বাক্যে–

ক. ইহার বেশি শুনিলে তোদের কলব ফাটিয়া যাইবে। খ. লজ্জায় এমদাদের রাগ হইল।
গ. সকলেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। ঘ. সারাদিন আয়োজন চলিল।

পাঠ-২

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- হুযুর কেবলার মুরিদ হবার পর এমদাদের শারীরিক-মানসিক অবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।
- হুযুর কেবলার ভণ্ডামি ও নারী-লোলুপতার চিত্র অঙ্কন করতে পারবেন।

মূলপাঠ

চার

পীর সাহেব অনেক নিষেধ করিলেন। বলিলেন : বাবা, সংসার ছাড়িয়া থাকিতে পারবে না, তাসাউওয়াফ বড় কঠিন জিনিস ইত্যাদি।

কিন্তু এমদাদ তাওয়াজ্জোহ লইল।

পীর সাহেব নিজের লতিফায় যেকের জারি করিয়া সেই যেকের এমদাদের লতিফায় নিক্ষেপ করিলেন।

এমদাদ প্রথম লতিফা জেকরে-জলী আরম্ভ করিল।

সে দিবানিশি দুই চোখ বুজিয়া পীর সাহেবের নির্দেশমত 'এলহু এলহু' করিতে লাগিল।

পীর সাহেব বলিয়াছিলেন : খেলওয়াৎ-দর-আঞ্জুমান দ্বারা নিজের কলবকে স্বীয় লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জাহ করিতে পারিলে তার কলবে যাতে-আহাদিয়তের ফয়েয হাসেল হইবে এবং তার রুহ ঘড়ির কাঁটর ন্যায় কাঁপিতে থাকিবে।

কিন্তু এমদাদ অনেক চেষ্টা করিয়াও তার কলবকে লতিফায় মুতাওয়াজ্জাহ করিতে পারিল না। তৎপরিবর্তে তার চোখের সামনে পীর সাহেবের মেহেদি-রঞ্জিত দাড়ি ও তাঁর রূপা-বাঁধানো গড়গড়ার ছবি ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

ফলে তার কলবে যাতে আহাদিয়তের ফয়েয হাসেল হইয়া তার রুহকে ঘড়ির কাটার মতো কাঁপাইবার পরিবর্তে ফুফু-আম্মার স্মৃতি বাড়ি যাইবার জন্য তার মনকে উচাটন করিয়া তুলিতে লাগিল।

দিন যাইতে লাগিল।

অনাহারে অনিদ্রায় এমদাদের চোখ দু'টি মস্তকের মধ্যে প্রবেশ করিল। তার শরীর নিতান্ত দুর্বল ও মন অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িল।

সে বুঝিল, এইভাবে আরও কিছুদিন গেলে তার রুহু বস্তুতই জেসম হইতে আযাদ হইয়া আলমে-আমরে চলিয়া যাইবে।

সে স্থির করিল, পীর সাহেবের কাছে নিজের অক্ষমতার কথা নিবেদন করিয়া সে একদিন বিদায় হইবে।

কিন্তু বলি বলি করিয়াও কথাটা বলিতে পরিল না।

একটা নতুন ঘটনায় সে বিদায়ের কথাটা আপাতত চাপিয়া গেল। দূরবর্তী একস্থানে মুরিদগণ পীর সাহেবকে দাওয়াত করিল।

প্রকাণ্ড বজরায় একমণ ঘি, আড়াইমণ তেল, দশমণ সরু চাউল, তিনশত মুরগি, সাত সের অম্বুরি তামাক এবং তেরজন শাগরেদ লইয়া পীর সাহেব 'মুরিদানে' রওয়ানা হইলেন।

পীর সাহেবের ভ্রমণ বৃত্তান্ত ইংরাজিতে লিখিয়া কলিকাতায় সংবাদপত্রে পাঠাইবার জন্য এমদাদকেও সঙ্গে লওয়া হইল। নদীর সৌন্দর্য, নদীপারের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য এমদাদের কাছে বেশ লাগিল।

পীর সাহেব গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইলেন।

তিনি মুরীদগণের নিকট যে অভ্যর্থনা পাইলেন, তাহা দেখিলে অনেক রাজা-বাদশাহ রাজত্ব ছাড়িয়া মোরাকেবা-মোশাহেদায় বসিতেন।

পীর সাহেব গ্রামের মোড়লের বাড়িতে আস্তানা করিলেন ।

বিভিন্ন দিন বিভিন্ন মুরিদের বাড়িতে বিরাট ভোজ চলিতে লাগিল।

পীর সাহেবের একটু দূরে বসিয়া গুরুভোজন করিয়া এমদাদ এত দিনের কৃচ্ছ সাধনার প্রতিশোধ লইতে লাগিল। ইহাতে প্রথম-প্রথম তার একটু পেটে পীড়া দেখা দিলেও শীঘ্রই সে সামলাইয়া উঠিল এবং তার শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও চেহারা বেশ চিকনাই হইয়া উঠিতে লাগিল।

পীর সাহেবের ভাত ভাঙিবার কসরত দেখার সুযোগ ইতিপূর্বে এমদাদের হয় নাই। এইবার সে ভাগ্য লাভ করিয়া এমদাদ বুঝিল : পীর সাহেবের রূহানীশক্তি যত বেশিই থাকুক না কেন, তাঁর হজমশক্তি নিশ্চয়ই তার চেয়ে বেশি।

সন্ধ্যায় পুরুষদের জন্য মজলিশ বসিত।

রাতে এশার নামাজের পর অন্দর মহলে মেয়েদের জন্য ওয়াজ হইত। কারণ অন্য সময় মেয়েদের কাজে ব্যস্ত থাকিতে হয়।

সেখানে পুরুষদের প্রবেশ নিষেধ ছিল।

স্ত্রীলোকদিগকে ধর্মকথা বুঝাইতে একটু দেরি হইত। কারণ মেয়েলোকের বুদ্ধিসুদ্ধি বড় কম−তারা নাকেস−আকেল।

কিন্তু বাড়িওয়ালার ছেলে রজবের সুন্দরী স্ত্রী কলিমন সম্বন্ধে পীর সাহেবের ধারণা ছিল অন্যরকম। মেয়ে-মজলিশে ওয়াজ করিবার সময় তিনি ইহারই দিকে ঘন-ঘন দৃষ্টিপাত করিতেন।

তিনি অনেক সময় বলিতেন : তাসাউওয়াফের বাতেনী কথা বুঝিবার ক্ষমতা এই মেয়েটার মধ্যেই কিছু আছে। ভালো করিয়া তওয়াজ্জোহ দিলে তাকে আবেদা রাবেয়ার দরজায় পৌঁছাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

এশার নামাজের পর দাড়িতে চিরুণী ও কাপড়ে আতর লাগান সুন্নত এবং পীর সাহেব সুন্নতের একজন বড় মো'তেকাদ ছিলেন।

ওয়াজ করিবার সময় পীর সাহেবের প্রায়ই জযবা আসিত।

সে জয্‌বাকে মুরিদগণ 'ফানাফিল্লাহ' বলিত।

এই ফানাফিল্লাহর সময় পীর সাহেব 'জ্বলিয়া গেলাম' 'পুড়িয়া গেলাম' বলিয়া চিৎকার করিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িতেন। এই সময় পীর সাহেবের রুহ আলমে–খালক হইতে আলমে-আমরে পৌঁছিয়া রুহে ইযদানির সঙ্গে ফানা হইয়া যাইত এবং নূরে ইয্‌দানি তাঁর চোখের উপর আসিয়া পড়িত। কিন্তু সে নূরের জলওয়া পীর সাহেবের চক্ষে সহ্য হইত না বলিয়া তিনি এইরুপ চিৎকার করিতেন।

তাই জয্‌বার সময় একখণ্ড কালো মখমল দিয়া পীর সাহেবের চোখ-মুখ ঢাকিয়া দিয়া তাঁর হাত-পা টিপিয়া দিবার ওসিয়ত ছিল।

এইরূপ জয্‌বা পীর সাহেবের প্রায়ই হইত।

–এবং মেয়েদের সামনে ওয়াজ করিবার সময়েই একটু বেশি হইত।

এই সব ব্যাপারে এমদাদের মনে একটু খট্‌কার সৃষ্টি হইল। কিন্তু সে জোর করিয়া মনকে ভক্তিমান রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

সে চেষ্টায় সফল হইবার আগেই কিন্তু ও-পথে বাধা পড়িল। প্রধান খলিফা সুফী বদরুদ্দীন সাহেবের সঙ্গে পীর সাহেবকে প্রায়ই কানাকানি করিতে দেখিয়া এমদাদের মনের খট্‌কা বাড়িয়া গেল। তার মনে পীর সাহেবের প্রতি একটা দুর্নিবার সন্দেহের ছায়াপাত হইল।

এমন সময় পীর সাহেব অত্যন্ত অকস্মাৎ একদিন ঘোষণা করিলেন : তিনি আর দু'এক দিনের বেশি সে অঞ্চলে তশরিফ রাখিবেন না।

এই গভীর শোক সংবাদে শাগরেদ-মুরিদগণের সকলেই নিতান্ত গম্ভীর হইয়া পড়িল। জনৈক শাগরেদ সুফী সাহেবের ইশারায় বলিলেন : হুজুর কেবলা আপনি একদিন বলিয়াছিলেন, এবার এ-অঞ্চলের মুরিদগণকে কেরামতে-নেস্‌বতে-বায়ানান্নাস দেখাইবেন? তা না দেখাইয়াই কি হুযুর মাঝে মাঝে কেরামত দেখান না বলিয়া উম্মী মুরিদগণের অনেকেই গোমরাহ হইয়া যাইতেছে। মওলানা লকবধারী ঐ ভণ্ডটা ও-পাড়ার অনেক মুরিদকে ভাগাইয়া নিতেছে; সে নাকি বৎসর বৎসর একবার আসিয়া কেরামত দেখাইয়া যায়।

পীর সাহেব গম্ভীর মুখে বলিলেন : (আরবি ও উর্দু) আল্লাহই কেরামতের একমাত্র মালিক, মানুষের সাধ্য কি কেরামত দেখায়? ও-সব শয়তানের চেলাদের কথা আমার সামনে বলিও না। তবে হ্যাঁ, মোরাকেবায়ে-নেস্‌বতে-বায়নান্নাস-এর তরকিব দেখাইব বলিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তার আর সময় কোথায়?

সমস্ত সাগরেদ ও মুরিদগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন : না হুজুর, সময় করিতেই হইবে, এবার উহা না দেখিয়া ছাড়িব না।

অগত্যা পীর সাহেব রাযী হইলেন।

স্থির হইল, সেই রাত্রেই মোরাকেবা বসিবে।

সারাদিন আয়োজন চলিল।

রাত্রে মৌলুদের মাহফিল বসিল। হযরত পয়গম্বর সাহেবের অনেক-অনেক মোওয়াজেযাত বর্ণিত হইল।

মৌলদ শেষে খাওয়া-দাওয়া হইল এবং তৎপর মোরাকেবার বৈঠক বসিল।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

আযাদ– স্বাধীন, মুক্ত। **উচাটন–** ব্যাকুল, উৎকণ্ঠিত, অস্বস্তিপূর্ণ। **ওয়াজ–** উপদেশ, ধর্মব্যাখ্যা, ধর্মকথা প্রচার। **ওসিয়ত–** অন্তিম উপদেশ বা নির্দেশ। **খলিফা–** এখানে প্রতিনিধি অর্থে ব্যবহৃত। **কেরামত–** ক্ষমতা, অলৌকিক শক্তি, বুজুর্গি।

গড়গড়া– তামাক খাবার জন্য ব্যবহৃত ধাতুনির্মিত বৃহৎ হুঁকা। **গোমরাহ–** অপ্রসন্ন, ক্ষিপ্ত, অসহিষ্ণু। **চিকনাই–** ঔজ্জ্বল্য, স্বাস্থ্যবান। **জেসম–** দেহ। **তশরিফ–** উপস্থিত থাকা, হাজির থাকা। **তাসাউওয়াফ–** সুফি মতবাদ, সুফিদের অধ্যাত্ম সাধনা। **ফানাফিল্লাহ–** আত্মহারা বা তন্ময় অবস্থা। **বাতেনী কথা–** শাস্ত্রসম্পৃক্ত গোপন কথা, যেসব ঐশী কথা সর্বসাধারণের নিকট প্রকাশনীয় নয়। **মজলিস–** আসর, বৈঠক, সভা। **মাহফিল–** ধর্মসভা। **মোরাকেবা–** স্বর্গীয় ধ্যানে মগ্ন, আল্লাহর এবাদতে তন্ময়। **রুহানীশক্তি–** অন্তর থেকে জাত শক্তি, আধ্যাত্মিক জ্ঞান। **শাগরেদ–** শিষ্য, মুরিদ। **সুন্নত–** হাদিস শরিফে বর্ণিত কর্ম ও আচরণ বিধি, হজরত মুহম্মদের (সা.) নির্দেশিত কাজ।

সারসংক্ষেপ :

পীরের মুরিদ হওয়ার পর এমদাদ পুনরায় এবাদত শুরু করে। সংযম ও কৃচ্ছ্রসাধনায় এমদাদের শরীর দিনে দিনে ক্ষয়ে যেতে থাকে। পীরের বাড়ি থেকে চলে যাবে- এমন ভাবনা দেখা দেয় এমদাদের মনে। এ সময় ইংরেজি জানার কারণে পীরের সফরসঙ্গী হওয়ার সুযোগ আসে এমদাদের। পীরের বাড়ি যাওয়ার পর গুরু ভোজনের কারণে এমদাদ অল্প দিনেই পূর্বের স্বাস্থ্য ফিরে পেল। পীরের নানা কর্মকাণ্ডে এমদাদ চিন্তিত হয়ে পড়ে। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল পীরের অসঙ্গত আচার-আচরণ। পীর সাহেবের ভাত ভাঙবার কসরত, নারীদের ধর্মকথা শোনানোর কৌশল, বাড়িওয়ালার ছেলে রজবের সুন্দরী স্ত্রী কলিমনের দিকে বারবার দৃষ্টিপাত, ফানাফিল্লার সময় 'জ্বলিয়া গেলাম, পুড়িয়া গেলাম' চিৎকার, নারীমহলে ওয়াজের সময় দাড়িতে চিরুনি ও কাপড়ে আতর লাগানো, সুফি বদরুদ্দীনের সঙ্গে মাঝে মাঝে পীরের কানাকানি– এমন সব ঘটনা ও দৃশ্য দেখে এমদাদের মনে হুযুর কেবলার সততা নিয়ে সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

৫. পীর সাহেব কোথায় আস্তানা গেড়েছেন?

ক. মোড়ল বাড়ি খ. রুহ রজব
গ. বদরুদ্দিন সাহেবের ঘর ঘ. নুরের জলওয়া

৬. মেয়েরা 'নাকেস-আকেল', কারণ–

ক. ধর্মকথা বোঝে না খ. বুদ্ধিসুদ্ধি কম
গ. বাতেনি কথা বোঝে ঘ. রুহানি শক্তি বেশি

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

নাফি লন্ডন থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে সম্প্রতি দেশে ফিরে এসেছে। কিছুকাল পরেই কোর্টে প্র্যাকটিস্ শুরু করবে এই তার ইচ্ছা। কিন্তু স্ব-গ্রামের লোকদের ধর্মীয় কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাস তার মনকে ব্যথিত করে। সে গ্রামে শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে অন্ধকার দূর করতে চায়।

৭. উদ্দীপকের নাফি 'হুজুর কেবলা' গল্পের কোন চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক. এমদাদ খ. রজব
গ. কলিমন ঘ. সিদ্দিকুল্লাহ

৮. উদ্দীপকের অধিবাসীদের সঙ্গে 'হুজুর কেবলা' গল্পে যে বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে–

i. গোঁড়ামি
ii. অজ্ঞতা
iii. কুসংস্কার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i, ii ও ii

পাঠ-৩

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- পীর সাহেব ও তার সাগরেদ বদরুদ্দীনের ভণ্ডামি বিশদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- এমদাদের করুণ পরিণতি আলোচনা করতে পারবেন ।
- পীর সাহেবের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে পারবেন ।

মূলপাঠ

পাঁচ.

পীর সাহেব বলিলেন : আজ তোমাদের আমি যে মোরাকেবার তরকিব দেখাইব, ইহা দ্বারা আমার যে-কোনো লোকের রুহের সঙ্গে কথা বলতে পারি। আমি যদি মোরাকাবায় বসি, তবে সেই রুহ গোপনে আমার সঙ্গে কথা বলিয়া চলিয়া যাইবে। তোমরা কিছুই দেখিতে পাইবে না। তোমাদের মধ্যে একজন মোরাকাবায় বস, তোমরা যার কথা বলিবে আমি তার রুহের দিকে তাওয়াজ্জোহ দেখাইয়া তারই রুহের ফয়েজ হাসিল করিব। তৎপর তোমরা যে কেহ তার সঙ্গে কথা বলিতে পারিবে।

তোমাদের মধ্যে কে মোরাকাবায় বসিবে? সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল।

কেহই কোন কথা বলিল না, মোরাকাবায় বসিতে কেহই অগ্রসর হইল না।

এমদাদ দাঁড়াইয়া বলিল : আমি বসিব।

পীর সাহেব একটু হাসিলেন।

বলিলেন : বাবা, মোরাকেবা অত সোজা নয়। তুই আজিও যেকরে-খফা-আম করিস নাই, মোরাকেবায় বসিতে চাস?

–বলিয়া তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

দেখাদেখি উপস্থিত সকলেই হাসিয়া উঠিল।

লজ্জায় এমদাদের রাগ হইল। সে বসিয়া পড়িল।

পীর সাহেব আবার বলিলেন : কি, আমার মুরিদগণের মধ্যে আজিও কারও এতদূর রুহানী তরক্কী হাসিল হয় নাই, যে মোরাকেবায় বসিতে পারে? আমার খলিফাদের মধ্যেও কেহ নাই?

–বলিয়া তিনি শাগরেদদের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন।

প্রধান খলিফা সুফি সাহেব উঠিয়া বলিলেন : হুজুর কেবলা কি তবে বান্দাকে হুকুম করিতেছেন? আমি তো আপনার আদেশে কতবার মোরাকেবায়-নেস্‌বতে-বায়নান্নাসে বসিয়াছি। কোনও নতুন লোককে বসাইলে হইত না?

সুফি সাহেব আরও অনেকবার বসিয়াছেন শুনিয়া মুরিদগণের অন্তরে একটু সাহসের উদ্রেক হইল।

তারা সকলে সমস্বরে বলিল : আপনিই বসুন, আপনিই বসুন।

অগত্যা পীর সাহেবের আদেশে সুফী সাহেব মোরাকেবায় বসিলেন।

পীর সাহেব উপস্থিত দর্শকদের দিকে চাহিয়া বলিলেন : কার রুহের ফয়েয হাসেল করিব?

মুরিদগণের মুখের কথা যোগাইবার আগেই জনৈক সাগরেদ বলিলেন : এইমাত্র মৌলুদ-শরিফ হইয়াছ; হযরত পয়গম্বর সাহেবের মোয়াজেযা বয়ান হইয়াছে। তাঁরই রুহ আনা হোক।

সকলেই খুশি হইয়া বলিলেন : তাই হউক, তাই হউক। তাই হইল।

সুফী সাহেব আতর-সিক্ত মুখমণ্ডলে গালিচায় তাকিয়া হেলান দিয়া বসিলেন। চারদিকে আগরবাতি জ্বালাইয়া দেওয়া হইল। মেশক্‌ যাফরান ও আতরের গন্ধে ঘর ভরিয়া গেল।

পীর সাহেব তাঁর প্রধান খলিফার রুহে শেষ পয়গম্বর হযরত মোহাম্মদের রুহ মোবারক নাযেল করিবার জন্য ঠিক তাঁর সামনে বসিলেন।

শাগরেদরা চারিদিকে ঘিরিয়া বসিয়া মিলিত-কণ্ঠে সুর করিয়া দরুদ পাঠ করিতে লাগিলেন। পীর সাহেবের চোখে-মুখে ফুঁকিতে লাগিলে।

কিছুক্ষণ ফুঁকিবার পর শাগরেদগণকে চুপ করিতে ইঙ্গিত করিয়া পীর সাহেব বুকে হাত বাঁধিয়া একদৃষ্টে, সুফী সাহেবের বুকের দুইটা বোতাম খুলিয়া তাঁর বুকের খানিকটা অংশ ফাঁক করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, পীর সাহেব তাঁর দৃষ্টি সেইখানেই নিবদ্ধ করিলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সুফী সাহেবের শরীর কাঁপিতে লাগিল। কম্পন ক্রমেই বাড়িয়া গেল। সুফী সাহেব ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন এবং হাত পা ছুড়িতে ছুড়িতে মুর্ছিতের ন্যায় বিছানায় লুটাইয়া পড়িলেন।

পীর সাহেব মুরিদগণের দিকে চাহিয়া বলিলেন : বদর বাবাজীর একটু তক্‌লিফ হইল। কি করিব? পরের রুহের উপর অন্য রুহের ফয়েয হাসেল আসানিব সঙ্গে করা বেল্‌কুল না-মোমকেন। যা হউক, হযরতের রুহ তশরিফ আনিয়াছেন। তোমরা সকলে উঠিয়া কেয়াম কর।

–বলিয়া তিনি স্বয়ং উঠিয়া পড়িলেন। সকলেই দাঁড়াইয়া সমস্বরে পড়িতে লাগিল : ইয়া নবী সালাম আলায় কা ইত্যাদি।

কেয়াম ও দরুদ শেষ হইলে অভ্যাস মত অনেকেই বসিয়া পড়িল।

পীর সাহেব ধমক দিয়া বলিলেন : হযরতের রুহে পাক এখনও এই মজলিসে হাজির আছেন, তোমরা কেহ বসিতে পারিবে না। কার কী সওয়াল করিবার আছে, করিতে পার।

এমদাদ একটা বিষম ধাঁধায় পড়িয়া গেল। সে ইহাকে কিছুতেই সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে পারিল না।

–মাথায় এক ফন্দি আঁটিয়া অগ্রসর হইয়া বলিল : কেবলা, আমি কোন সওয়াল করিতে পারি?

পীর সাহেব চোখ গরম করিয়া বলিলেন : যাও না, জিজ্ঞাসা কর না গিয়া!

বলিয়া কণ্ঠস্বর অপেক্ষাকৃত মোলায়েম করিয়া আবার বলিলেন : বাবা সকলের কথাই যদি রুহে-পাকের কাছে পঁহুছিত, তবে দুনিয়ার সব মানুষই ওলি-আল্লাহ হইয়া যাইত।

এমদাদ তথাপি সুফী সাহেবের দিকে চাহিয়া বলিল : আপনি যদি হযরত পয়গম্বর সাহেবের রুহ হন, তবে আমার দরুদ-সালাম জানিবেন।

হযরতের রুহ কোন জবাব দিল না।

পীর সাহেব এমদাদের কাঁধে হাত দিয়া তাকে একদিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন : অধিকক্ষণ রুহে পাককে রাখা বে-আদবি হইবে। তোমাদের যদি কাহারও সিনা সাফ হইয়া থাকে, তবে আসিয়া যে কোন সওয়াল করিতে পার।

–বলিতেই পীর সাহেবের অন্যতম খলিফা মওলানা বেলায়েতপুরী সাহেব অগ্রসর হইয়া 'আস্‌সালামো আলাইকুম ইয়া রাসূলুল্লাহ' বলিয়া সুফী সাহেবের সামনে দাঁড়াইলেন। সকলে বিস্মিত হইয়া শুনিল সুফী সাহেবের মুখ দিয়া বাহির হইল : ওয়া আলায়কুমস্ সালাম, ইয়া উম্মতী।

মওলানা সাহেব বলিলেন : হে রেসালত-পনা, সৈয়দুল কাওনায়েন, আমি আপনার খেদমতে একটা আরয করিতে চাই।

আওয়াজ হইল : শিগ্‌গির বল, আমার আর দেরী করিবার উপায় নাই। মওলানা : আমাদের পীর দস্তগির কেবলা সাহেব নূরে-ইয-দানির জলওয়া সহ্য করিতে পারেন না, ইহার কারণ কি? তাঁর আমলে কি কোনও গলদ আছে?

বলিয়া পীর সাহেব কাঁদিয়া ফেলিলেন।

সুফী সাহেবের অচেতন দেহের মধ্য হইতে আওয়াজ হইল : হে আমার পিয়ারা উম্মৎ, ঘাবড়াইও না। তোমার উপর আল্লাহর রহমৎ হইবে। তুমি মারফৎ খুঁজিতেছ। কিন্তু শরিয়ত ত্যাগ করিয়া কি মারফৎ হয়।

পীর সাহেব হাত কচলাইয়া বলিলেন : হুজুর, আমি কবে শরিয়ত অবহেলা করিলাম?

উত্তর হইল : অবহেলা কর নাই, কিন্তু পালনও কর নাই। আমি শরিয়তে চার বিবি হালাল করিয়াছি। কিন্তু তোমার মাত্র তিন বিবি। যারা সাধারণ দুনিয়াদার মানুষ তাদের এক বিবি হইলেও চলিতে পারে। কিন্তু যারা রুহানী ফয়েয হাসেল

করিতে চায়, তাদের চার বিবি ছাড়া উপায় নাই। আমি চার বিবির ব্যবস্থা কেন করিয়াছি, তোমরা কিছু বুঝিয়াছ? চার দিয়াই এ দুনিয়া, চার দিয়াই আখেরাত। চার দিকে যা দেখ সবই খোদা চার চিজ দিয়া পয়দা করিয়াছেন। চার চিজ দিয়া খোদাতা'লা আদম সৃষ্টি করিয়া তার হেদায়েতের জন্য চার কিতাব পাঠাইয়াছেন। সেই হেদায়েত পাইতে হইলে মানুষকে চারের ফাঁদে ফেলিয়া খোদাতা'লা চার কুরসির অন্তরালে লুকাইয়া আছেন। এই চারের পরদা ঠেলিয়া আলমে-আমরে নূরে-ইয়্দানিতে ফানা হইতে হইবে, দুনিয়াতে চার বিবির ভজনা করিতে হইবে। পীর সাহেব সকলকে শুনাইয়া হযরতের রুহের দিকে চাহিয়া বলিলেন : এই বৃদ্ধ বয়সে আবার বিবাহ করিব?

–তুমি বৃদ্ধ? আমি ষাট বৎসর বয়সে নবম বার বিবাহ করিয়াছিলাম।

পীর সাহেব মিনতি ভরা কণ্ঠে বলিলেন : না রেসালত-পনা আমি আর বিবাহ করিব না।

–না কর, ভালই। কিন্তু তোমার রুহানী কামালিয়ত হাসেল হইবে না। তুমি নূরে-ইয়্দানির জলওয়া বরদাশত করিতে পারিবে না। তোমার মুরিদানের কেহই নফসানিয়তের হাত এড়াইতে পারিবে না।

পীর সাহেব হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বলিলেন : আমি নিজের জন্য ভাবি না ইয়া রাসুলুল্লাহ; কিন্তু যখন আমার মুরিদগণের অনিষ্ট হইবে, তখন বিবাহ করিতে রাজি হইলাম। কিন্তু আমি এক বুড়িকে বিবাহ করিব।

–তুমি তওবা আসতাগফার পড়। তুমি খোদার কলম রদ করিতে চাও? তোমার বিবাহ ঠিক হইয়া আছে। বেহেস্তে আমি তার ছবি দেখিয়া আসিয়াছি।

–সে কে, ইয়া রসুলুল্লাহ?

–এই বাড়ির তোমার মুরিদের ছোট ছেলে রজবের স্ত্রী কলিমন।

–ইয়া রসুলুল্লাহ, আমি মুরিদের স্ত্রীকে বিবাহ করিব? সে যে আমার বেটার বউ-এর শামিল।

–ইয়া উম্মতি, আমি আমার পালিত পুত্র যায়েদের স্ত্রীকে নিকাহ্ করিয়াছিলাম, আর তুমি একজন মুরিদের স্ত্রীকে নিকাহ্ করিতে পারিবে না?

ইয়া রসুল্লাহ, সে যে সধবা!

রজবকে বল স্ত্রীকে তালাক দিতে। কলিমন তোমার জন্যই হালাল। এ মারফতি নিকায়া ইদ্দত পালনের প্রয়োজন হইবে না। আমি থাকিতে পারি না। চলিলাম। অরাহমাতুল্লাহ আলাইকুম, ইয়া উম্মতি।

মূর্ছিত সুফী সাহেব একটা বিকট চিৎকার করিলেন। পীর সাহেবের অপর-অপর শাগরেদরা তাঁকে সজোরে পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন।

মুরিদগণের সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও পীর সাহেবের মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন : চাই না আমি রুহানী কামালিয়ত। আমি মুরিদের বউকে বিবাহ করিতে পারিব না।

গ্রাম্য মুরিদগণ আখেরাতের ভয়ে পীর সাহেবের অনেক হাতে-পায়ে ধারিল। পীর সাহেব অটল।

এই সময় প্রধান খলিফা সুফী সাহেব স্মরণ করাইয়া দিলেন : এই নিকাহ না করিলে কেবল পীর সাহেবের একারই রুহানী লোকসান হইবে না, তাঁর মুরিদগণের সকলের রুহের উপরও বহুত মুসিবত পড়িবে। তখন পীর সাহেব অগত্যা নিজের রেজামন্দী জানাইয়া দাড়িতে হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিতে লাগিলেন, সোবহান আল্লাহ! এ সবই কুদরতে এলাহি! তাঁরই শানে আযিম! আল্লাহ্ পাক নিজেই কোরআন–মজিদে ফরমাইয়াছেন : (আরবি ও উর্দু) ... ।

বাপ-চাচা-পাড়া-পড়শির অনুরোধে, আদেশে, তিরস্কারে ও অবশেষে উৎপীড়নে তিষ্টিতে না পারিয়া রজব তার এক বছর আগে বিয়া-করা আদরের স্ত্রীকে তালাক দিল এবং কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছিতে মুছিতে বাড়ির বাহির হইয়া গেল।

কলিমনের ঘন-ঘন মূর্ছার মধ্যে অতিশয় ত্রস্ততার সঙ্গে শুভকার্য সমাধা হইয়া গেল। এমদাদ স্তম্ভিত হইয়া বর বেশে সজ্জিত পীর সাহেবের দিকে চাহিয়া ছিল। তার চোখ হইতে আগুন ঠিকরাইয়া বাহির হইতেছিল।

এইবার তার চেতনা ফিরিয়া আসিল। সে এক লাফে বরাসনে-উপবিষ্ট পীর সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁর মেহেদি-রঞ্জিত দাড়ি ধরিয়া হেচ্কা টান মারিয়া বলিল : রে ভণ্ড শয়তান! নিজের পাপ-বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য দুইটা তরুণ প্রাণ এমন দুঃখময় করিয়া দিতে তোর বুকে বাজিল না?

আর বলিতে পারিল না। শাগরেদ-মুরিদরা সকলে মার্ মার্ করিয়া আসিয়া এমদাদকে ধরিয়া ফেলিল এবং চড়-চাপড় মারিতে লাগিল।

এমদাদ গ্রামের মাতব্বর সাহেবের দিকে চাহিয়া বলিল : তোমরা নিতান্ত মূর্খ। এই ভণ্ডের চালাকি বুঝিতে পারিতেছ না? নিজে শখ মিটাইবার জন্য হযরত পয়গম্বর সাহেবকে লইয়া তামাসা করিয়া তাঁর অপমান করিতেছে। তোমরা এই শয়তানকে পুলিশে দাও।

পীর সাহেবের প্রতি এমদাদের বেয়াদবিতে মুরিদরা ইতিপূর্বে একটু অসন্তুষ্ট হইয়া ছিল। এবার তার মস্তিষ্ক বিকৃতি সম্বন্ধে তারা নিঃসন্দেহ হইল। মাতব্বর সাহেব হুকুম করিলেন : এই পাগলটা আমাদের হুজুর কেবলার অপমান করিতেছে। তোমরা কয়েকজন ইহাকে কান ধরিয়া গ্রামের বাহির করিয়া দিয়া আস।

ভূলুণ্ঠিত পীর সাহেব ইতিমধ্যে উঠিয়া 'আস্তাগফেরুল্লাহ' পড়িতে পড়িতে তাঁর আলুলায়িত দাড়িতে আঙ্গুল দিয়া চিরুণী করিতেছিলেন। মাতব্বর সাহেবের হুকুমের পিঠে তিনি হুকুম করিলেন : দেখিস বাবারা, ওকে বেশি মারপিট করিস না। ও পাগল। ওর মাথা খারাপ। ওর বাপ ওকে আমার হাতে সঁপিয়া দিয়াছিল। অনেক তাবিজ দিলাম। কিন্তু কোনো ফল হইল না। খোদা যাকে শাফা না দেন, তাকে কে ভাল করিতে পারে? (আরবি ও উর্দু)।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

আখেরাত– শেষজীবন, পরকাল। **আরয–** প্রার্থনা, অনুরোধ। **কুদরত–** মহিমাবিশেষ, অলৌকিক শক্তি। **কেবলা–** মক্কার পবিত্র কাবাগৃহের দিক, যেদিকে মুখ করে নামাজ পড়া হয়। এখানে পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি হিসেবে ব্যবহৃত। **কেয়াম–** মিলাদ পাঠের সময়ে হজরত মুহাম্মদের (সা.) স্মৃতির সম্মানে দাঁড়ানো, নামাজের সময় দণ্ডায়মান অবস্থা। **খেদমত–** সেবাযত্ন, পরিচর্যা। **তওবা–** পুনরায় পাপ কাজ না করার জন্য সংকল্প, ইসলাম-নির্দেশিত ধর্মপথে প্রত্যাবর্তন। **পঁহুছিত–** পৌছাত। **পয়গম্বর–** বাণী বা বার্তাবাহক, নবী, রসুল, আল্লাহর প্রেরিত দূত। **মারফৎ–** মাধ্যম, অধ্যাত্মসাধনার শেষ স্তর। **যাফরান–** পারস্যের পুষ্পবিশেষের কেশর। **শরিয়ত–** ইসলামি কানুন, ইসলাম সম্মত জীবনবিধান। **শাফা–** আরোগ্য, মুক্তি, পরিত্রাণ, **সওয়াল–** জেরা, প্রার্থনা। **সিনা–** বক্ষঃস্থল, বুকের প্রস্থ, ছাতি।

সারসংক্ষেপ :

মুরিদের পৌনঃপুনিক অনুরোধে পীর সাহেব একসময় তার কেরামতি দেখাতে রাজি হলেন। মোরাকেবায় বসার জন্য মুরিদদের অনুরোধ করলে এগিয়ে আসে এমদাদ। কিন্তু উদ্যোগ সফল হবে না, তাই এমদাদকে মোরাকেবায় বসতে দিলেন না পীর সাহেব। শেষ পর্যন্ত সুফী বদরুদ্দীন মোরাকেবায় বসলেন। বদরুদ্দীনের দেহে আনা হল হজরত মুহম্মদের (সা.) রুহ। এই রুহই বলেন যে, পীর সাহেবের আরও একটা বিয়ে করা প্রয়োজন এবং তার চতুর্থ বিবি হবে রজবের স্ত্রী কলিমন। রুহের নির্দেশ মত ভণ্ড হুযুর কেবলা বিয়ে করেন রজবের স্ত্রী কলিমনকে। পীরের এসব কর্মকাণ্ড সহ্য করতে না পেরে একসময় এমদাদ আক্রমণ করে বসে পীর সাহেবকে। পীরের মুরিদরা দ্রুত এমদাদকে নিবৃত্ত করল এবং মাতব্বরের নির্দেশে তাকে গ্রাম থেকে বের করে দিল ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৯. পীর সাহেবের আদেশে কে মোরাকেবায় বসে?

ক. এমদাদ | খ. রজব
গ. সাদুল্লাহ | ঘ. বদরুদ্দীন

১০. এমদাদকে গ্রামের বাইরে বের করে দেয়া হয় যে কারণে–

ক. পীরকে অপমান করায় | খ. পীরকে সহযোগিতা করায়
গ. মোরাকাবায় বসতে চাওয়ায় | ঘ. ফয়েয লাভে অসমর্থ হওয়ায়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

'খোদা, রক্ষা কর! রক্ষা কর খোদা! রহম কর এই অধমগুলোর ওপর!' কান্নায় ভেঙে পড়লেন জমির বেপারি। মনে মনে মানত করলেন। যদি ফসল নষ্ট না হয় তাহলে হালের গরু জোড়া পির সাহেবকে দেবেন তিনি।

১১. উদ্দীপকের জমির বেপারি 'হুজুর কেবলা' গল্পে কার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

ক. গ্রাম্য মুরিদ খ. এমদাদ
গ. বেলায়েতপুরী ঘ. গ্রাম্য মাতব্বর

১২. উদ্দীপক ও 'হুজুর কেবলা' গল্পে প্রকাশিত হয়েছে–

ক. দেশপ্রেম খ. আদর্শবোধ
গ. সামাজিক প্রতিপত্তি ঘ. কুসংস্কারাচ্ছন্নতা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১৩. 'হুজুর কেবলা' গল্পে পির সাহেব কখন নারীদের আসরে বয়ান করতেন?

ক. এশার পর খ. সন্ধ্যার আগে
গ. মোরাকাবার পর ঘ. কেয়ামের আগে

১৪. 'নাকেস-আকেল' হচ্ছে–

ক. কম বুদ্ধি খ. বেশি বুদ্ধি
গ. রুহানি শক্তি ঘ. হজম শক্তি

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১৫ ও ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

কাজি মুন্সি ইদ্দত পালন ব্যতিরেকে আফরিনাকে বিয়ে করে চতুর্থ স্ত্রী হিসাবে ঘরে তোলেন। মুন্সি সাহেবের মতে, শাদি করা ইসলামের ধর্মীয় বিধান। এতে দোষের কিছু নেই।

১৫. উদ্দীপকের কাজি মুন্সীর সঙ্গে 'হুজুর কেবলা' গল্পে কোন চরিত্রের মিল রয়েছে?

ক. সুফি সাহেব খ. পীর সাহেব
গ. মোড়ল ঘ. লতিফা

১৬. এরূপ সাদৃশ্যের কারণ হলো–

ক. সামাজিক প্রয়োজন খ. ধর্মের অপব্যবহার
গ. পিতৃত্বের অহংকার ঘ. বংশ রক্ষা

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ :

মতি মাস্টার এত লোক জোটাল কেমন করে? কাজী বাড়ির পড়ুয়া ছেলে রশিদকে দলের মধ্যে দেখে আরো একটু অবাক হল ছকু। ব্যাপারটা অনেক দূর আঁচ করতে পারল সে। গতকাল কাজী পাড়ায় বুড়ো কাজীর সঙ্গে তর্ক করছিল মতি মাস্টার। গত কয়েক বছর কি খোদারে ডাকেন নাই আপনারা? হ্যাঁ, ডাকছিলেন। কিন্তু ফল কী হয়েছে? ফসল কি বাঁচছে আপনাগো? বাঁচে নাই। তাই কইতে আছলাম কেবল বইসা বইসা খোদারে ডাকলে চলবো না। এ কয়টা গাঁয়ে মানুষ তো আমরা কম নই। সবাই মিলে বাঁধটারে যদি পাহারা দিই, সাধ্য কী বাঁধ ভাঙে? মতি মাস্টারের কথা শুনে দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে এসেছিলেন বুড়ো কাজী।

ক. পীর সাহেবের বাড়িতে কয়টি তলা রয়েছে?
খ. 'খোদা যাকে শাফা না দেন, তাকে কে ভাল করিতে পারে?' –উক্তিটি বুঝিয়ে বলুন।
গ. উদ্দীপকের মতি মাস্টার 'হুজুর কেবলা' গল্পের কোন চরিত্রটির সঙ্গে তুলনীয়? –ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. "আলোকিত সমাজ গড়তে হলে প্রয়োজন মুক্তবুদ্ধি ও প্রদীপ্ত চেতনার মানুষ।" – উদ্দীপক ও 'হুজুর কেবলা' গল্পের আলোকে মন্তব্যটি বিচার করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন-১

ক.

পীর সাহেবের বাড়িটি একতলা পাকা বাড়ি।

খ.

'খোদা যাকে শাফা না দেন, তাকে কে ভাল করিতে পারে?'– উক্তিটির মধ্য দিয়ে সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছাশক্তি ও মানুষের অসহায়ত্বকে তুলে ধরা হয়েছে।

'হুজুর কেবলা' গল্পে পীর সাহেব মুরিদ রজবের স্ত্রী কলিমনকে রুহ পাকের নির্দেশে বিয়ে করেন। এমদাদ ধর্মের নামে পীর সাহেবের এই প্রতারণার প্রতিবাদ করলে পীর সাহেবের ধর্মান্ধ মুরিদরা তাকে অপমান করে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেয়। পীর সাহেবের মতে এমদাদ মানসিক রোগী এবং তাঁর চেষ্টা সত্ত্বেও ভালো হয়নি। কেননা খোদা যাকে ভালো না করেন মানুষের পক্ষে তাকে ভালো করা অসম্ভব। উক্তিটিতে পীর সাহেবের ধর্মব্যবসায়ের স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে।

গ.

উদ্দীপকের মতি মাস্টার চরিত্রটি 'হুজুর কেবলা' গল্পে এমদাদের সঙ্গে তুলনীয়।

ধর্মান্ধতা সমাজ ও সভ্যতার প্রগতিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে ধর্মব্যবসায়ীরা ধর্মকে নিজেদের ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে। তারা সর্বদাই মানুষের ধর্মভীরুতার সুযোগ নিয়ে নিজ স্বার্থ উদ্ধারে তৎপর হয়। কিন্তু কোনো প্রগতিশীল মানুষের নিকট ধর্মান্ধতার চিত্র ধরা পড়লে তারা এর প্রতিবাদ জানায়।

উদ্দীপকের মতি মাস্টার একজন প্রগতিশীল শিক্ষিত মানুষ। কাজী বাড়ির পড়ুয়া ছেলে রশিদকে তিনি দলে টেনে প্রচলিত বিশ্বাসের বাইরে গিয়েছেন। গ্রামের মানুষকে সম্মিলিত করে বাঁধ পাহারা দিয়ে গ্রামকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। অন্যদিকে 'হুজুর কেবলা' গল্পে এমদাদও একজন উচ্চশিক্ষিত প্রগতিমনা ব্যক্তি। সে অনেকটা কৌতূহলবশে প্রথাগত জীবন ত্যাগ করে পীরের মুরিদ হয়। কিন্তু যখন সে জানতে পারে যে উদ্দিষ্ট পীর সাহেব একজন নারীলোলুপ, ভণ্ড ও প্রতারক, তখন সে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। পরিণতিতে পীর সাহেবের ধর্মান্ধ মুরিদরা এমদাদকে গ্রামের বাইরে বের করে দেয়। এভাবে চেতনাগত দিক থেকে উদ্দীপকের মতি মাস্টার চরিত্রটি 'হুজুর কেবলা' গল্পের এমদাদের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ.

'আলোকিত সমাজ গড়তে হলে প্রয়োজন উদ্দীপকের মতি মাস্টার ও 'হুজুর কেবলা' গল্পের এমদাদের মতো মুক্তবুদ্ধি ও প্রদীপ্ত চেতনার মানুষ।' –মন্তব্যটি যথার্থ হয়েছে।

পৃথিবীতে যুগে যুগে অনেক প্রগতিশীল চেতনার মানুষ জন্মগ্রহণ করেছেন। সঙ্গত কারণে তাঁরা মানবীয় মূল্যবোধকে নিজ চেতনায় ধারণ করেন। তাঁদের চেতনায় থাকে দেশ, সমাজ ও মানবজাতির সার্বিক কল্যাণ। অনেক সময় তাঁদের এ স্বপ্ন প্রাচীনপন্থি, ধর্মব্যবসায়ী ও প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের দ্বারা বিপন্ন হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আলোর মুখ দেখে।

উদ্দীপকে গ্রামের মানুষগুলো প্রচলিত প্রথায় বিশ্বাস করে। তারা মনে করে যে ঘরে বসে কেবল খোদাকে ডাকলেই বাঁধ রক্ষা পাবে। তাদের ফসল বেঁচে যাবে। ধর্মের সঙ্গে কর্মপ্রচেষ্টাকে তারা গুরুত্ব দেয়নি। মতি মাস্টার গ্রামীণ সমাজের এই প্রচলিত বিশ্বাসের মূলে আঘাত হেনেছেন। অন্যদিকে 'হুজুর কেবলা' গল্পে পীর সাহেব একজন ভণ্ড ও প্রতারক। তিনি গ্রামের সহজ-সরল মানুষকে ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে শোষণ করেন। কিন্তু প্রগতি চেতনায় বিশ্বাসী যুবক এমদাদ পীর সাহেবের এসব অপকর্ম আপন চেষ্টায় রুখে দেয়।

উদ্দীপকে মতি মাস্টারকে সংগ্রাম করতে হয়েছে মানুষের অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের বিপক্ষে। আর 'হুজুর কেবলা' গল্পে এমদাদ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে শঠতা ও ভণ্ডামিতে পূর্ণ একজন পীর সাহেবের বিরুদ্ধে। উদ্দীপকের মতি মাস্টার ও 'হুজুর কেবলা' গল্পের এমদাদ উভয়েই মানবিক মূল্যবোধ ও প্রগতি চেতনায় বিশ্বাসী আধুনিক মানুষ। তাই বলা যায়, আলোকিত সমাজ গড়তে হলে এদের মতো মুক্তচিন্তার মানুষের প্রয়োজন রয়েছে।

অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

ধর্মীয় বিশ্বাস মানব জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। কেননা ধর্ম মানুষের আজন্ম লালিত সংস্কৃতি। একবার ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর এক পুত্রের মৃত্যুর দিন সমস্ত আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গেল। সকলে বলাবলি করতে লাগল যে, রসুল (স.)-এর পুত্রের মৃত্যুতে প্রকৃতি শোক পালন করছে। কিন্তু শোকার্ত মুহাম্মদ (স.) তাদের বললেন,“প্রাকৃতিক এসব বিষয় মানুষের ক্ষমতার বাইরে।” তিনি সকলকে কুসংস্কারমুক্ত হওয়ার জন্য উপদেশ দিলেন।

ক. রজব কতদিন আগে বিয়ে করেছিল?

খ. ‘তুমি মারফত খুঁজিতেছ।’ –উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।

গ. উদ্দীপকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে ‘হুজুর কেবলা’ গল্পের সাদৃশ্য কিংবা বৈসাদৃশ্য নিরূপণ করুন।

ঘ. “হুজুর কেবলা’ গল্পের চরিত্রগুলোর মানসিকতা উদ্দীপকের ভাবনার বিপরীতধর্মী।” –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খ ২. ক ৩. খ ৪. ক ৫. ক ৬. খ ৭. ক ৮. ঘ ৯. ঘ ১০. ক ১১. ক ১২. ঘ
১৩. ক ১৪. ক ১৫. খ ১৬. খ

অর্জুন মণ্ডল

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ‘শ্রেষ্ঠগল্প’ (১৯৯৬) গ্রন্থ থেকে ‘অর্জুন মণ্ডল’ গল্পটি সংকলিত হয়েছে। ছোটগল্পের অন্তিমে ব্যঞ্জনাময় মোচড় দিয়ে গল্প কাহিনিকে গভীরতর জীবনসত্যে পৌঁছে দিতে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) এর কোনো জুড়ি নেই। মানুষের মনস্তত্ব বিশ্লেষণে তিনি নিপুণ শিল্পী। আলোচ্য গল্পে বয়স্ক এক ব্যক্তির বিদ্যালাভের প্রয়াস যেমন কৌতুককর তেমনি অনুসরণযোগ্য, এমন ভাব প্রকাশিত হয়েছে।

সাধারণ উদ্দেশ্য

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ‘অর্জুন মণ্ডল’ গল্পটি পাঠ করে আপনি–

- ছোটগল্প হিসেবে ‘অর্জুন মণ্ডল’ –এর সার্থকতা বিচার করতে পারবেন।
- অর্জুন মণ্ডলের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- শিক্ষালাভের জন্য অর্জুন মণ্ডলের আগ্রহের পরিচয় দিতে পারবেন।

পাঠ-১

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- জমিদারের পাইক-পেয়াদার নির্যাতন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- অর্জুন মণ্ডলের পরিচয় দিতে পারবেন।
- অর্জুন মণ্ডলের লেখাপড়ার আগ্রহ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।

মূলপাঠ

এক

কড়া নাড়ার শব্দ উঠে বসলাম। শীতকালে এত রাত্রে কে এল আবার?

কে?

আমি, আমি–কপাট খোল।

খুললাম। সুইচ টিপে বারান্দার আলোটা জ্বালালাম। দেখি খর্বকায় একটি বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন। আজানুলম্বিত গলাবন্ধ খদ্দরের কোট গায়ে। মাথায় সামনের দিকটা কেশ-বিরল, চোখ নিষ্প্রভ, ভুরুতে পাক ধরেছে, সমস্ত মুখে বলিরেখা, সামনে গোটা দুই দাঁত নেই।

আমার চিঠি পাওনি নিশ্চয়?

না।

চিতুয়া পোস্ট করেনি তা হলে? শালা ডাকু। নিজে হাতে পোষ্ট করলেই ঠিক হত, তাকে দেওয়াই ভুল হয়েছিল। ভুল ভুল– এ জীবনটা ভুল করতে করতেই কাটল বীরেনবাবু।

হঠাৎ অর্জুনকাকাকে চিনতে পারলাম আমি। ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বরই চিনিয়ে দিল তাঁকে। বহুদিনের যবনিকা সরে গেল যেন।

অর্জুনকাকা! হঠাৎ এত রাত্রে কোথা থেকে?

তীর্থে যাচ্ছি। ভাবলাম, তোমার সঙ্গে একবার দেখা করে যাই। শহরের জিনিসপত্রও কিনতে হবে কিছু। তোমাকে এত রাত্রে ঘুম ভাঙিয়ে কষ্ট দিলাম বোধ হয়। আমার ধারণা ছিল, চিঠি পেয়েছ তুমি।

না, না, তার জন্যে কী হয়েছে–

হয়নি কিছু। তোমার কাছে খবর না দিয়ে আসবার জোরও আমার আছে। কিন্তু চিতুয়াটার কথাই ভাবছি। এই সব ছোটোখাটো ব্যাপার থেকেই মানুষের ভবিষ্যৎ বুঝা যায় কিনা–

অর্জুনকাকা মাঝে মাঝে কথাবার্তাতেও শুদ্ধ ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেন। 'বুঝা' 'দিব' নিয়ে আগে কত হাসহাসি করেছি আমরা।

ডাকের গোলমাল হয়েছে হয়ত।

না, ও কথা মানব না আমি।

অর্জুনকাকা বারান্দা থেকে নেমে গেলেন এবং গাড়ি থেকে নিজেই নিজের জিনিসপত্র নামাতে উদ্যত হলেন।

আপনি ছেড়ে দিন না, গাড়োয়ানই নামাবে এখন।

কেন ওকে বেশি পয়সা দিতে যাব মিছামিছি।

'মিছামিছি'ও অর্জুনকাকার বিশেষত্ব।

দাঁড়ান, আমার চাকরটিকে ডাকি তা হলে।

চাকরকেই বা ডাকবে কেন? আমার গায়ে জোর নাই নাকি?

অবলীলাক্রমে নামিয়ে ফেললেন সব! বিছানা, প্রকাণ্ড একটা তোরঙ্গ, লোহার উনুনও একটা। চুক্তি-মাফিক গাড়োয়ানকে পাই-পয়সা মিটিয়ে দিয়ে আমার দিকে ফিরে বললেন, কোন্ ঘরটায় শুব?

বাইরের দিকে খালি ঘর ছিল একখানা। তাতে একটা চৌকিও ছিল।

সেইটেই খুলে দিলাম। অর্জুনকাকা বললেন, যাও, তুমি শুয়ে পড় এইবার। অনেক রাত হয়েছে। আমি এই চৌকির উপর নিজেই বিছানা বিছিয়ে নিচ্ছি। তুমি যাও।

আপনার খাওয়া-দাওয়া?

রাত্রে আমি কিছুই খাই না।

দু-চারখানা লুচি-টুচি ভেজে দিক না, কী আর এমন রাত হয়েছে?

বিছানা পাততে পাততে অর্জুনকাকা বললেন, তোমার সঙ্গে কি লৌকিকতা করছি?

চুপ করে রইলাম।

হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, চিতুয়া এবারও ম্যাট্রিক পাস করতে পারেনি, বুঝলে?

ও।

নিজেই ভুগবে শালা। আমার কী!

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

যাও, আর রাত করো না, শুয়ে পড়।

সত্যিই কিছু খাবেন না?

দেখ, বেশি যদি পীড়াপীড়ি কর, বিছানাপত্র গুটিয়ে নিয়ে স্টেশন প্লাটফর্মে চলে যাব তাহলে।

বুঝলাম, অর্জুনকাকা বদলাননি। আর দ্বিরুক্তি না করে শুতে চলে গেলাম। শুলাম বটে, কিন্তু ঘুম এল না। অর্জুনকাকার কথাই ভাবতে লাগলাম। অর্জুনকাকার কথা বাবার মুখে খানিকটা শুনেছি– নিজেও দেখেছি খানিকটা, আশ্চর্য জীবন লোকটার! স্বাধীন দেশে জন্মালে দিগ্বিজয় করতে পারতেন। এ দেশে কিছু হল না। জাতে জেলে। চল্লিশ বছর পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিলেন। মাথায় করে মাছের ঝুড়ি বয়ে নিয়ে এসে হাটে বেচতেন। আমাদের বাড়ির সামনে। আমাদের বাড়ির ঠিক সামনেই হাট বসত। অর্জুনকাকার সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয়ের দৃশ্যটা এখনও আমার মনে আছে।

হাটে প্রচণ্ড একটা গোলমাল উঠল একদিন। চিৎকার চেঁচামেচি কলরব। আর্তনাদে সমস্ত জনতা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল যেন। একটা জায়গায় ভিড়টা জমাট বেঁধে গেল। মনে হতে লাগল, তার কেন্দ্রে ভয়াবহ কী যেন একটা হচ্ছে। হঠাৎ ভিড় ঠেলে অর্জুনকাকা বেরিয়ে এলেন। তাঁর বগলে একটা রুইমাছ। বাবা হাসপাতালের বারান্দায় বসে কাজ করছিলেন। অর্জুনকাকা ছুটে এসে মাছটা দড়াম করে সামনে ফেলে বাবার পা দুটো জড়িয়ে ধরলেন।

আমায় বাঁচান আপনি ডাক্তারবাবু, শালারা আমার সব কেড়ে নিচ্ছে।

বাবা শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কী কেড়ে নিচ্ছে? কারা?

জমিদারের সিপাহীরা। মাছ কেড়ে নিচ্ছে আমার। রোজই নেয় কিছু কিছু। আজ এই বড় রুইটা নিতে যাচ্ছিল। দেব না বললাম তো মারলে এক চড়। আমি ঘুরিয়ে এক চড় মেরেছি শালাকে।

গুরুতর ব্যাপার। প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদারের বিরুদ্ধে সামান্য জেলের এই বিদ্রোহ হেসে উড়িয়ে দেবার মতো তুচ্ছ ঘটনা নয়। বাবা একটু বিব্রত হলেন। সামান্য অবাধ্যতার জন্য এই জমিদার একজন গরিব প্রজার ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছেন কিছুদিন আগে।

আচ্ছা, তুমি চুপ করে বস এইখানে।

বাবার পা ছেড়ে অর্জুনকাকা এক কোণে বসলেন গিয়ে। সিপাহী দুজনও এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, এর মাছ কেড়ে নিচ্ছিলে কেন তোমরা?

এটেই তো রেওয়াজ হ্যায় হুজুর! মাহিনামে একঠো বড়া মছলি তো উপসকো দেনাই চালিয়ে!

নেহি দেগো– কোণ থেকে গর্জন করে উঠলেন অর্জুনকাকা।

সিপাহীদের চক্ষু অগ্নিবর্ষণ করতে লাগল।

ডাক্তার বলে বাবাকে ইতর ভদ্র সকলেই খাতির করত। তাই সিপাহীরা আত্মসম্বরণ করে দাঁড়িয়ে রইল।

বাবা সিপাহীদের বললেন, আচ্ছা, তোমরা যাও। তোমাদের মালিককে যা বলবার আমি বলব। ওকে তোমরা কিছু বলো না এখন।

সিপাহীরা চলে গেল।

জমিদারও বাবাকে খুব খাতির করতেন। অর্জুনকাকার কিছু হল না। বাবার খাতিরে জমিদার তার মাছ নেওয়াই মাপ করে দিলেন। অতিশয় সামান্য ব্যাপার। জমিদাররা মানীর মান রাখার জন্যে হামেশাই এ রকম করে থাকেন। অর্জুনকাকার কিন্তু তাক লেগে গেল। অত বড় দুর্ধর্ষ রাবণ মিশির লিকলিকে রোগা এই ডাক্তারবাবুটির কাছে একেবারে কেঁচো। উঃ বিদ্যার কী প্রতাপ! কী হবে পয়সায়, কী হবে জমিদারিতে, বিদ্যাই আসল জিনিস, বশিষ্ঠের তপোবল দেখে বিশ্বামিত্রের যে অবস্থা হয়েছিল অর্জুনকাকার অনেকটা তাই হল।

উক্ত ঘটনার দিন সাতেক পরে অর্জুনকাকা একদিন এসে একটু কাঁচামাচু হয়ে বাবাকে বললেন আমার একটা আরজি আছে ডাক্তারবাবু।

কী বল?

আমি কিছু লিখাপড়া করতে চাই। আপনি আমাকে সাহায্য করুন।

এইবার বাবার তাক লাগল।

তুমি লেখাপড়া করবে! তোমার সংসার দেখবে কে?

আমার স্ত্রী। আমার জমি-জমা কিছু আছে, আমার স্ত্রী ধান কুটে, ছাতু পিষে– চলে যাবে কোনো রকমে। আমিও রোজগার করব কিন্তু।

কটি ছেলেপিলে তোমার?

সাতটি মেয়ে, ছেলে নাই।

বাবার হাসি নিচ্ছিল, কিন্তু অর্জুনকাকার চোখে জ্বলন্ত আগ্রহ দেখে হাস্য সংবরণ করতে হলে তাঁকে।

পড়াশোনা করবে, সে তো ভালো কথাই। কিন্তু করবে কী করে? স্কুলে তো আর নেবে না তোমায়–

নেবে না?

এ বয়সে কি আর স্কুলে নেয়!

তবু আমি পড়ব। আপনি যদি একটু দয়া করেন, তাহলে হয়।

কী করব বল?

আপনার চরণে যদি আশ্রয় দেন একটু। আপনার হাতায় আমি ছোট কুঁড়ে বেঁধে থাকব, আর আপনার ছেলেদের কাছেই পড়ব, তাদের পুরনো বই-টই নিয়ে–

বাবা একটা চুপ করে রইলেন। অর্জুনকাকার আগ্রহ দেখে তাঁকে তিনি নিরস্ত করতে পারলেন না, অথচ এ-রকম একটা অসম্ভব প্রস্তাবে সায় দিতেও কেমন যেন লাগছিল তাঁর।

একটু চুপ করে থেকে দ্বিধাভরে শেষে বললেন, বেশ, পার তো আমার আপত্তি কী!

তার পরদিন বাঁশ খড় দড়ি কাটারি শাবল কোদাল নিয়ে অর্জুনকাকা এসে পড়লেন, দেখতে দেখতে ছোট কুঁড়েঘরটি বানিয়ে ফেললেন। আমরা খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলাম আর সেই দিন থেকে তিনি হলেন আমাদের অর্জুনকাকা। আমাদের যে মাস্টারমশাই পড়াতেন, তিনিই অর্জুনকাকার অক্ষরপরিচয় করিয়ে হাতেখড়ি দিয়ে দিলেন। আমাদেরই প্রথম ভাগ এবং ফার্স্টবুক নিয়ে তাঁর পড়া শুরু হয়ে গেল। কিন্তু দেখতে দেখতে আমাদের ছাড়িয়ে গেলেন তিনি।

অর্জুনকাকা খুব ভোরে উঠতেন– এত ভোরে যে, আমরা টেরই পেতাম না। আমরা উঠে দেখতাম, তিনি কাজে বেরিয়ে গেছেন। মজুরের কাজ করে বেড়াতেন দিনের বেলায়। যা পেতেন স্ত্রীকে দিয়ে আসতেন। ফিরতেন বিকেলে। বিকেলে এসেই তিনি খাওয়া-দাওয়া করতেন। প্রায়ই রাঁধতেন না। দই চিঁড়ে কলা প্রিয় খাদ্য ছিল তাঁর, ছাতু খেতেন কখনও কখনও। খেয়ে উঠেই হাতের লেখা লিখতেন দিনের আলো থাকতে থাকতে। সন্ধ্যা হলে প্রদীপ জ্বেলে পড়তে বসতেন। রেড়ির তেলের বেশ বড় একটা প্রদীপ ছিল তাঁর। ভোরে কাজে বেরোবার আগে তিনি যে পড়াটা পড়তেন, তা আমরা দেখতে পেতাম না। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা যেভাবে পড়তেন, তার থেকে তা আন্দাজ করে নেওয়া অসম্ভব ছিল না। শিরদাঁড়া একটু বেঁকতে দেখিনি। টেবিল চেয়ার ছিল না, আমাদের মতো চাপটালি খেয়েও বসতে পারতেন না তিনি, উবু হয়ে বসতেন। সামনে থাকত একটা কেরোসিন কাঠের বাক্স, তার উপর খবরের কাগজ পাতা। তাতেই একটি ছোট ইটের উপর তিনি প্রদীপটি রাখতেন। সেই কেরোসিন কাঠের বাক্সটি একধারে ছিল তাঁর টেবিল এবং শেলফ্। নিচের ফাঁকটায় তাঁর বই খাতা দোয়াত কলম থাকত। কী সুন্দরভাবে যে গুছিয়ে রাখতেন সেগুলিকে! খাগের কলমটি; পেন্সিলটি নিখুঁতভাবে কাটা। আমার পেন্সিল-কলমও তিনিই বেড়ে দিতেন। পিতলের দোয়াতটি ঝকঝক করত। প্রত্যেক বইয়ে কী সুন্দর মলাট দিতেন।

কিছুক্ষণ পড়বার পরই কিন্তু ঘুম পেতে তাঁর। কিন্তু ঘুমের কাছে আত্মসমর্পণ করবার লোক অর্জুনকাকা নন। উঠে চা করতেন ঘুঁটের উনুন জ্বেলে। ঘুঁটের ধোঁয়ায় শুধু ঘুম নয়, মশাও পালাত। এক ঘাটি চা খেতেন তিনি– এক-আধ কাপ নয়। রাত্রে আর কিছু খেতেন না। চা খেয়ে আবার শুরু করতেন পড়া। কিছুক্ষণ পরে আবার ঢুল ধরত। চোখে সরষের তেল দিতেন। মাথার চুল ধরে টানতেন। ঠাস ঠাস করে নিজের গালে চড়ও মারতেন কখনও কখনও। আমরা হাসতাম। কারণ অর্জুনকাকার সাধনার ঠিক স্বরূপটি বোঝবার মতো বয়স হয়নি আমাদের তখনও। এখন বুঝতে পারি, পুরাকালে শিক্ষার্থী যেমন গুরু-গৃহে বাস করে অধ্যয়ন করত, অর্জুনকাকাও তেমনি আমাদের বাড়িতে থেকে পড়তেন। অর্জুনকাকার গুরুস্থানীয় হবার মতো লোক অবশ্য কেউ ছিল না, তিনি নিজেই নিজের গুরু ছিলেন, কিন্তু তাঁর মনোভাব ছিল সেকালের বিদ্যার্থীদের মতো। ও-রকম নিষ্ঠা আর কোথাও দেখিনি। মাঝে মাঝে দুই-এক দিনের জন্য বাড়ি যেতেন অবশ্য, কিন্তু তা দুই-এক

দিনের জন্যই। মাসের অধিকাংশ দিনই পড়াশোনা করতেন তাঁর কুঁড়েঘরে বসে। এইভাবে পড়ে বছর দেড়েকের মধ্যে বাংলায় 'সীতার বনবাস' এবং ইংরেজিতে 'রয়েল রীডার নম্বর ফোর' পর্যন্ত পড়ে ফেললেন তিনি, আরও শিখলেন কিছু কিছু। যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, ত্রৈরাশিক বেশ কষতে পারতেন। তাঁর উৎসাহ দেখে স্কুলের মাস্টার পণ্ডিত সবাই সাহায্য করতেন তাঁকে। অর্জুনকাকা বিনামূল্যে কারও সাহায্য নেবার লোক নন। নানাভাবে প্রতিদানও দিতেন তিনি। দইটা মাছটা কলাটা মূলোটা তো দিতেনই, সেবাও করতেন। কারও পা টিপে দিতেন, কারও কাপড় কেচে দিতেন, কারও বাজার করে দিতেন, কিছুতেই আপত্তি ছিল না তাঁর।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

আজানুলম্বিত– জানু বা হাঁটু পর্যন্ত লম্বা বা দীর্ঘ। **আরজি–** প্রার্থনা, অনুরোধ। **কলরব–** কোলাহল, গণ্ডগোল, চিৎকার। **খদ্দর–** মোটা কাপড়। **খর্বকায়–** ক্ষুদ্র দেহ, বেঁটে, বামন। **গাড়োয়ান–** যানচালক, গাড়িচালক। **তোরঙ্গ–** বাক্স, ট্র্যাঙ্ক, পেঁটরা। **ত্রৈরাশিক–** তিনটি রাশির পরস্পর সম্বন্ধঘটিত অঙ্কপ্রণালি। **দ্বিরুক্তি–** দুই বার বলা বা উল্লেখ করা। **নিষ্প্রভ–** নিস্তেজ, দীপ্তিহীন। **বলিরেখা–** মাংসের বা চর্মের কুঞ্চজাত রেখা। **বশিষ্ট–** প্রাচীন ভারতের একজন ঋষি। **বিশ্বামিত্র–** ঋষি, ব্রহ্মার মানসপুত্র। **যবনিকা–** পর্দা। **রেড়ির তেল–** ভেরেণ্ডা-বীজ থেকে প্রস্তুত তেল। **শশব্যস্ত–** খরগোশের মতো অত্যন্ত ত্বরাযুক্ত বা ব্যস্তসমস্ত। **হামেশা–** প্রায়ই, সর্বদা।

সারসংক্ষেপ :

বিস্ময়কর চরিত্রের মানুষ অর্জুন মণ্ডল। জমিদারের পেয়াদাদের হাত থেকে বাঁচার জন্য অর্জুন মণ্ডল কথকের পিতার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। তারপর একসময় তিনি কথকের পিতার কাছে আশ্রয় নেন ও শিক্ষালাভের অনুমতি প্রার্থনা করেন। অবশেষে অর্জুন মণ্ডল কথকের বাড়িতে আশ্রয় নিলেন এবং পাঠাভ্যাস আরম্ভ করলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অর্জুন মণ্ডল পড়ালেখায় বেশ উন্নতি করলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. অর্জুনকাকা কত বৎসর বয়সে পড়াশোনা শুরু করেন?

ক. চল্লিশ　　খ. পঁয়তাল্লিশ
গ. পঞ্চাশ　　ঘ. ষাট

২. বাবা অর্জুনকাকাকে পড়াশোনায় সাহায্য করেছেন–

ক. জ্বলন্ত আগ্রহ দেখে　　খ. জমিদারের খাতিরে
গ. অর্থোপার্জন করতে　　ঘ. দিগ্বিজয় করতে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

করিমের নিজের পুকুর নেই। সে গ্রামের মোড়লের পুকুর ইজারা নিয়ে মাছ চাষ করে। কিন্তু মোড়ল প্রায়ই করিমের নিকট থেকে ইজারার চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে। কখনো কখনো মোড়ল তার লাঠিয়াল বাহিনী দিয়ে পুকুর থেকে মাছ তুলে নিয়ে যায়।

৩. উদ্দীপকের করিম 'অর্জুন মণ্ডল' গল্পে কাকে প্রতিনিধিত্ব করে?

ক. অর্জুন মণ্ডল　　খ. সিভিল সার্জন
গ. জমিদার　　ঘ. চিত্তরঞ্জন

৪. উদ্দীপক এবং 'অর্জুন মণ্ডল' গল্পে কোন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে?

ক. মর্যাদাহীনতা　　খ. সহনশীলতা
গ. শোষণের চিত্র　　ঘ. শুচিতা

পাঠ-২

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- অর্জুন মণ্ডলের কতিপয় চরিত্রবৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অর্জুন মণ্ডলের ইংরেজি জ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করতে পারবেন।
- বিদ্যার্জনে অর্জুন মণ্ডলের আগ্রহ এবং সফলতা বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

এইভাবেই হয়ত আরও কিছুদিন চলত, কিন্তু হঠাৎ একদিন এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে সব ওলটপালট হয়ে গেল। হাসপাতাল পরিদর্শন করতে এক সাহেব সিভিল সার্জন এলেন একদিন। সকালে স্টেশনের কুলি তাঁর জিনিসপত্র বয়ে এনেছিল, কিন্তু সন্ধেবেলা ফেরবার সময় জিনিস বইবার লোক পেলেন না সাহেব। হাসপাতালের চাকরটা অসুস্থ, আমাদের চাকরও বাড়ি গিয়েছিল। কাছে কুলি-জাতীয় কাউকে না পেয়ে সাহেব (এবং বাবাও) বিপন্ন বোধ করছিলেন। স্টেশন বেশ একটু দূরে, সাহেবের মালও নেহাতে হালকা নয়। অর্জুনকাকা নিজের কুঁড়েঘরের দাওয়ায় বসে দড়ি পাকাচ্ছিলেন। অবসর সময়ে তিনি বসে বসে দড়ি পাকাতেন এবং প্রতি হাটে তা বিক্রি করতেন। বাবা গিয়ে তাঁকে বলতেই তিনি সাহেবের জিনিস বয়ে নিয়ে যেতে তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলেন। শুধু তাই না, এগিয়ে এসে সাহেবকে সেলাম করে বললেন- Yes sir, I shall carry your things most gladly। অর্জুনকাকার মুখে সাহেব ইংরেজি শুনবেন প্রত্যাশা করেননি, শুনে অবাক হয়ে গেলেন। বাবার মুখে অর্জুনকাকার ইতিহাস এবং অধ্যবসায়ের গল্প শুনে আরও মুগ্ধ হলেন। স্টেশনে মালপত্র নামাতেই সাহেব তাঁকে একটি টাকা দিতে গেলেন। অর্জুনকাকা পুনরায় সেলাম করে বললেন-Thank you sir, I am a labourer, on doubt, but I shall not accept anything from you.

বিস্মিত সাহেব প্রশ্ন করলেন, Why?

You are our Doctor Babu's honoured guest.

সাহেব অত্যন্ত খুশি হয়ে গেলেন। অর্জুনকাকা জিনিসপত্র নামিয়ে চলে যাবার পর সাহেব বাবাকে বললেন, ও যদি চায়, আপনি ওকে অ্যাপ্রেন্টিস ড্রেসার হিসেবে ভর্তি করে নিন। কিছুদিন পরে পরীক্ষা দিয়ে পাকা ড্রেসার হোক। তারপর ওকে আমি কম্পাউন্ডারি পড়বার জন্যেও স্কলারশিপ যোগাড় করে দেব।

খবরটা শুনে অর্জুনকাকা অবাক হয়ে গেলেন, একটু দমেও গেলেন। একাগ্রচিত্তে তিনি যে পথে সবেগে চলেছিলেন, হঠাৎ বাধা পেয়ে এবং সে বাধা দুরতিক্রম্য অনুভব করে (স্বয়ং ডাক্তারবাবু যখন তাকে ড্রেসার হতে বলেছেন তখন তা দুরতিক্রম্য ছাড়া আর কী!) অর্জুনকাকার এমন অদ্ভুত একটা ভাবান্তর হল যা প্রায় অবর্ণনীয়। হতাশা, জেদ, বাধ্যতা, আত্মসমর্পণ, ক্ষোভ এবং এই সবটার জন্য দায়ী যে অদৃশ্য শক্তি, তার বিরুদ্ধে আক্রোশ– সমস্তটা সমবেতভাবে ফুঠে উঠল তাঁর চোখে মুখে।

ইতঃপূর্বে তাঁর মুখের এ রকম ভাবান্তর আরও কয়েকবার লক্ষ করেছিলাম আমি; অর্জুনকাকা আমাদের কাছে অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যখন তাঁর ঘরে একা থাকতেন, আমি মাঝে মাঝে ফুটো দিয়ে (তাঁর দরমার ঝাঁপে অসংখ্য ফুটো ছিল) তাঁকে লক্ষ করতাম। তাঁর মুখে এ-রকম ভাবান্তর হতে অনেকবার দেখেছি। এর চেয়েও বেশি অস্থির হতেও দেখেছি। হঠাৎ তাঁর চোখমুখ কেমন যেন হয়ে যেত, উঠে অস্থিরভাবে পায়চারি করতেন, মনে হত, জিবটা যেন চিব্বুচ্ছো–নাকটা খুব জোরে কুঁচকে খুব ঘন ঘন চিবুতেন মনে হত। ছোট একটা হাতআয়না ছিল তাঁর। চালে গোঁজা থাকত সেটা। পায়চারি করতে করতে হঠাৎ সেইটে পেড়ে ভ্রূকুটি সহকারে নিজের প্রতিচ্ছবির দিকেই চেয়ে থাকতেন খানিকক্ষণ। অতীত জীবনে যে সব দুরতিক্রম্য বাধা তিনি অতিক্রম করতে পারেননি, অন্যায়ভাবে নিয়তির কাছে যতবার পরাভূত

হয়েছেন, তার সমস্ত পুঞ্জীভূত গ্লানি তাঁকে মাঝে মাঝে পাগল করে তুলত বোধ হয়। আয়নার দিকে চেয়ে নিজেই নিজেকে ভ্যাঙচাতেন। হয়ত কথঞ্চিৎ শক্তি পেতেন তাতে।

বাবার কথা শুনে বললেন, কাল থেকে ঘা ধোয়াব! সে কী। তিন-তিনখানা ডিক্‌শনারি আনতে দিয়েছি আমি–

অত ডিক্‌শনারি কী হবে?

মুখস্থ করব।

মুখস্থ করবে? কী হবে ডিক্‌শনারি মুখস্থ করে? তা ছাড়া অত পড়েই বা তোমার লাভ কী, পরীক্ষা তো তোমার দিতে দেবে না।

দেবে না? কেন?

এই নিয়ম। প্রাইভেট্‌লি মেয়েরা পরীক্ষা দিতে পারে। আর পারে শিক্ষকরা– তাও তিন বছর চাকরি করার পর। অর্জুনকাকা বললেন, শুনেছি হাই স্কুলে টেস্ট পরীক্ষা দিয়ে ম্যাট্রিক দেওয়া যায়।

তা যায় বটে। কিন্তু তার পর আর পারবে না, কলেজে ভর্তি হতে হবে। আই. এ. পাস করতে বুড়ো হয়ে যাবে। তাতে লাভটা হবে কী? তার চেয়ে এতেই লেগে পড়। কম্পাউন্ডার হতে পার যদি কাজ হবে একটা।

অর্জুনকাকা চুপ করে রইলেন।

পরদিন থেকেই অ্যাপ্রেন্টিস ড্রেসারের পদে বহাল হয়ে গেলেন তিনি। ড্রেসার করিম মিয়ার কাছে প্রথম পাঠ নিলেন ব্যান্ডেজ পাকাতে হয় কী করে। করিম মিয়ার খুব সুবিধে হল। ছাপোষা লোক তিনি। মুরগি, ছাগল, গোটা দুই বিবি এবং গোটা বারো ছেলেমেয়ে নিয়ে এত ব্যতিব্যস্ত থাকতে হত তাঁকে যে, হাসপাতালে কাজে মন দেবার অবসর পেতেন না তিনি। বাবার কাছে প্রায়ই বকুনি খেতেন। অর্জুনকাকাকে শাগরেদ পেয়ে বেঁচে গেলেন তিনি। অর্জুনকাকাই সমস্ত কাজ করতে লাগলেন। সূর্যোদয়ের পূর্বে ব্যান্ডেজ পাকানো, ছুরি কাঁচি পরিষ্কার, খাতায় রুল টানা, টেবিল ঝাড়া– সমস্ত হয়ে যেত। হাসপাতালের চাকরটার আসতে দেরি হলে তার কাজও করে দিতেন। কম্পাউন্ডার হারাধনবাবুও প্রাক্‌টিস করবার সময় পেলেন। স্টক মিকশ্চার, স্টক মলম অর্জুনকাকাই করতে শিখে গেলেন অল্প কিছুদিনের পরে। সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি নিয়মিত পরিষ্কার করতেন, লেবেল ময়লা হয়ে গেলে পরিষ্কার অক্ষরে লিখতেন সেগুলি। এমন কি বাবার হয়ে রিটার্নও করে দিতেন প্রত্যহ। অর্জুনকাকা হাসপাতালের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠলেন দেখতে দেখতে। হাসপাতালের চেহারাই বদলে গেল। অর্জুনকাকার দৈনন্দিন কার্যক্রমও বদলে গেল অবশ্য খানিকটা। মজুরি খাটবার জন্যে আর বেরুতেন না। অ্যাপ্রেন্টিস ড্রেসার হিসেবে সিভিল সার্জন যে বেতন মঞ্জুর করেছিলেন, যদিও তা সামান্যই, কিন্তু তাতেই সন্তুষ্ট থাকতেন তিনি। লেখাপড়া বন্ধ করেননি, বরং বাড়িয়েছিলেন। বাংলায় বসুমতী সংস্করণের বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে অনেক গ্রন্থাবলিই কিনে পড়েছিলেন তিনি। ইংরেজিতে রবিনসন ক্রুসো, গ্যালিভার্স ট্রাভলস্, পিলগ্রিমস্ প্রগ্রেস জাতীয় বই কিনে শেষ করতে লাগলেন একটার পর একটা। ডিক্‌শনারি মুখস্থ করবার উদ্যমটা নিয়োজিত করতে হল ড্রেসারিবিষয়ক জ্ঞান আহরণে। কোর্স ছিল অবশ্য ছোট একখানা চটি বই। কিন্তু ওইটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকবার লোক অর্জুনকাকা নন। তিনি সেই বইটা আগাগোড়া মুখস্থ তো করলেনই, সে বিষয়ে আরও যে সব বই বাজারে ছিল তাও আনিয়ে পড়ে ফেললেন একে একে। এতে কিন্তু ফল শেষ পর্যন্ত ভালো হল না। কারণ সাহেব বদলি হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর জায়গায় এসেছিলেন অন্য একজন লোক।

তিনি এতবড় একজন দিগ্‌গজকে পরীক্ষার্থীরূপে পাবেন আশা করেননি। কোনো কোনো বিষয়ে অর্জুনকাকার জ্ঞান তাঁর চেয়েও বেশি– এটা বরদাস্ত করা শক্ত হল তাঁর পক্ষে। তিনি সহজ সরল উত্তর প্রত্যাশ্যা করেছিলেন। কিন্তু অর্জুনকাকা অনেক বই পড়েছেন, একই প্রশ্নের নানা বিচিত্র উত্তর জানা ছিল তাঁর। প্রত্যেক ব্যান্ডেজের উদ্ভব, উপযোগিতা, ইতিহাস, সুবিধা, অসুবিধা তন্ন তন্ন করে পড়েছিলেন তিনি। বড় বেশি কথা বলছে দেখে পরীক্ষক ধমক দিলেন। অর্জুনকাকা ধমকে নিরস্ত হবার লোক নন। রাত জেগে অনেক বই পড়েছেন, সমানে তর্ক করতে লাগলেন। পরীক্ষকের সঙ্গে তর্ক করা ডাক্তারি লাইনে শ্রেষ্ঠতম অপরাধ। ফেল হয়ে গেলেন তিনি। ফেল হয়ে অর্জুনকাকা যেদিন ফিরে এলেন, সেদিনও ওইরকম মুখভাব দেখেছিলাম তাঁর। হতাশ জেদ ক্ষোভ এবং সমস্তটার জন্য দায়ী যে দুরতিক্রম্য নিয়তি তাঁর আক্রোশ– এই সবগুলো একসঙ্গে যেন ফুটে উঠেছে তাঁর মুখভাবে, চোখের দৃষ্টিতে। সমস্ত দিন ঘর থেকে বেরুলেন না। মাঝে মাঝে সমস্ত মুখ ভ্রূকুটিকুটিল হয়ে উঠেছে, চালে গোঁজা আয়নাটা পেড়ে অতি কুৎসিতভাবে ভ্যাঙচাচ্ছে নিজেকে। অবশ্য ওই একদিন মাত্র। পরদিন থেকেই আবার কাজে লেগে গেলেন পূর্ণ উদ্যমে। যেন কিছুই হয়নি।

পরের বার পাস করলেন। কম্পাউন্ডারি পড়বার জন্যে স্কলারশিপও পেলেন। কিন্তু একটা মুশকিল হল। কম্পাউন্ডারি পড়বার জন্যে কটক যেতে হবে। পরিবার রেখে যাবেন কার কাছে? দিন কয়েকের ছুটি নিলেন। ছুটির পর ফিরে এসে কিন্তু তিনি যে খবর দিলেন তা অভাবনীয়।

পাশের গ্রামেই অর্জুনকাকার স্বজাতি বর্ধিষ্ণু গৃহস্থ ছিল এক ঘর। বেশ ভালো অবস্থা, ছোটখাটো জমিদারি আছে।

তাঁর সাত ছেলে। তিনি নাকি তাঁর সাত ছেলের সঙ্গে অর্জুনকাকার সাত মেয়ের বিয়ে দিতে চান। হাসপাতালে চাকরি হওয়াতে এবং আমাদের সম্পর্কে আসাতে অর্জুনকাকার একটা খ্যাতি রটে গিয়েছিল নিজেদের সমাজে। এ প্রস্তাবে আনন্দিত হওয়ার কথা, কিন্তু অর্জুনকাকা এতে বিপন্ন বোধ করলেন।

এ এক মহা আফৎ হল!

অর্জুনকাকা 'আপদ' কে 'আফৎ' বলতেন।

বাবা বলতেন, আমার তো মনে হচ্ছে ভালোই হল। মেয়েদের বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে পড়তে চলে যাও তুমি। মেয়েরা তোমার সুখে থাকবে। ওরা বড়লোক–

বড়লোক বলেই আমার আপত্তি। বড়লোক মানেই পাজি, বদমাস, চোর, লম্পট, লুচ্চা–

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন অর্জুনকাকা।

আপনি তো সব জানেন ডাক্তারবাবু, এই জমিদার শালারাই দেশকে চুষে খেয়ে ফেলল। আমার কী হয়েছিল– আপনি তো সবই জনেন, আপনি না থাকলে আমাকে কাঁচাই খেয়ে ফেলত শালারা।

সবাই খারাপ নয়। এরা লোক ভালো।

আপনি বলছেন?

অর্জুনকাকার মুখভাব আবার সেইরকম হয়ে উঠতে লাগল ক্রমশ। বড়লোকদের সঙ্গে কুটুম্বিতা করবার ইচ্ছে নেই তাঁর কিন্তু বাবা যখন এতে মত দিচ্ছেন তখন তা অমান্য করবার সাধ্যও নেই। দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তি।

বাবা বললেন তোমার মেয়েদের যদি বিয়ে না দাও, তা হলে কার কাছে রেখে যাবে ওদের? মাসখানেকের মধ্যেই তো কটক যেতে হবে তোমাকে।

তার জন্যে আবার ভাবনা ছিল না, আমার এক খুড়তুতো ভায়ের কাছে রেখে যাব ভেবেছিলাম। তাকে আনবার জন্যেই কসবায় গিয়েছিলাম ছুটি নিয়ে।

তোমার যা খুশি করতে পার। কিন্তু আমার মনে হয়, মেয়েদের বিয়ে দিয়ে যাওয়াই ভালো।– এই বলে বাবা উঠে গেলেন। অর্জুনকাকা চুপ করে বসে রইলেন। ক্রমশ তাঁর নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হতে লাগল। চোখ দুটো নিষ্পলক হয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর পলক ফেলে জিবটা চিবুতে শুরু করলেন তিনি।

বিয়ের দিনও এক কাণ্ড ঘটল। অর্জুনকাকা তার জমিদার বেয়াইকে জানিয়েছিলেন যে, তিনি গরিব মানুষ, বেশি বয়যাত্রীর হাঙ্গামা বরদাস্ত করবার শক্তি নেই তাঁর, কুড়ি জনের বেশি বরযাত্রী যেন আনা না হয়। বিয়ের দিন দেখা গেল, পঞ্চাশটা ঢোল, কুড়িটা রামশিঙে, পনেরটা কাঁসি এবং দশটা সানাই সমভিব্যবহারে এক বিরাট জনতা চতুর্দিক সচকিত করে অর্জুনকাকার বাড়ির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। অর্জুনকাকা সোজা থানায় চলে গেলেন। দারোগাকে গিয়ে বললেন, আমার বাড়িতে ডাকাত পড়েছে, বাঁচান আমাকে। দারোগা সাহেব ঘোড়া ছুটিয়ে সত্যিই গিয়ে হাজির হয়েছিলেন অকুস্থলে। ব্যাপারটা অবশ্য পরিহাসেই পর্যবসিত হল শেষ পর্যন্ত। অর্জুনকাকার বেয়াই শুধু লোকজনই আনেননি, তাদের বসবার, শোবার, খাবার সমস্ত আয়োজনই সঙ্গে করে এনেছিলেন। অর্জুনকাকার বাড়ির সামনের মাঠে তাঁর প্রকাণ্ড তাঁবু পড়েছিল। অর্জুনকাকা কিন্তু এতে খুশি হলেন না। অপমানিত বোধ করলেন। ধনী-হস্তের এই অভিনব অস্ত্রে আহত হয়ে চুপ করে রইলেন। কারণ এ নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ চলে না। গুম হয়ে বসে রইলেন কেবল। হয়ত নির্জনে মুখ-ভঙ্গি করে নিজেই নিজেকে ভেঙচেছিলেন, কিন্তু সে খবর আমরা জানি না।

মেয়েদের বিয়ে হলে গেল। অর্জুনকাকা নিজের স্ত্রীকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে কটক চলে গেলেন।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অকুস্থলে– যেখানে ঘটনা ঘটেছে এমন স্থানে। **অধ্যবসায়–** ক্রমাগত চেষ্টা, অবিরাম সাধনা। **অপ্রত্যাশিত–** অভাবনীয়, আকস্মিক, আশা করা যায়নি এমন। **আফৎ–** আপদ, বিপদ, ঝামেলা। **অ্যাপ্রেন্টিস–** শিক্ষানবিশ, শিক্ষা গ্রহণ করা অবস্থা। **গ্যালিভার্স ট্রাভলস–** জোনাথান সুইফটের (১৬৬৭-১৭৪৫) বিখ্যাত গ্রন্থ, গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৭২৬ সালে। **ডিকশনারি–** অভিধান, শব্দকোষ। **ড্রেসার–** সজ্জাকার, রূপকার, পরিষ্কারক। **নিস্পলক–** পলকহীন। **দুর্লঙ্ঘ্য–** যা লঙ্ঘন করা যায় না। **পিলগ্রিমস প্রগ্রেস–** জন বেনিয়ানের (১৬২৮-১৬৮৮) বিখ্যাত গ্রন্থ, গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৬৭৮ সালে। **বরদাস্ত–** সহ্য করা, মেনে নেওয়া। **রবিনসন ক্রুশো–** ড্যানিয়েল ডিফোর (১৬৬০-১৭৩১) সুবিখ্যাত রচনা, এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৭১৯ সালে। **সম্মানিত–** শ্রদ্ধেয়।

সারসংক্ষেপ :

কথকের বাড়িতে অর্জুন মণ্ডল থাকার সময় অনেক মজার ঘটনা ঘটেছে। ইংরেজ সাহেবের কাছে ইংরেজিতে কথা বলে সকলকে বিস্মিত করে দিয়েছেন অর্জুন মণ্ডল। নানা কারণে অর্জুন মণ্ডল কথকের কাছে প্রিয় হয়ে উঠতে লাগলেন। কম্পাউন্ডারের কাজেও সাহায্য করতেন অর্জুন মণ্ডল। কিন্তু তার মন পড়ে থাকতো পড়ালেখার দিকে। অর্জুন মণ্ডলের বিবাহযোগ্য সাত কন্যা ছিল। সকলকে বিয়ে দিয়ে তিনি এক সময় কটকের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। উদ্দেশ্য অধ্যয়ন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫. অর্জুনকাকা কোন পদে চাকরি পেয়েছিলেন?

ক. পাকা ড্রেসার খ. কম্পাউন্ডার
গ. এ্যাপ্রেন্টিস ড্রেসার ঘ. স্টেশনের কুলি

৬. বিয়েতে বেয়াইর দেয়া সুবিধা নিতে আপত্তি কেন?

i. ওতে অপমান বোধ হয়
ii. গল্পকথকের পিতার 'মত' নেই
iii. জমিদার নির্যাতন করবেন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

"পড়ার কোন বয়স নাই
চল সবাই পড়তে যাই।"

৭. উদ্দীপকের বিষয়বস্ত 'অর্জুন মণ্ডল' গল্পের কোন চরিত্রকে প্রতিনিধিত্ব করে?

ক. অর্জুনকাকা খ. সিভিল সার্জন
গ. ডাক্তার বাবু ঘ. চিতোয়া

৮. 'অর্জুন মণ্ডল' গল্প ও উদ্দীপকে প্রত্যাশা করা হয়েছে–

ক. অধ্যবসায় খ. পরশ্রীকাতরতা
গ. শ্রমবিমুখতা ঘ. উদাসীনতা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৯. অর্জুন মণ্ডল কম্পাউন্ডারি পড়তে কোথায় গিয়েছিলেন?

ক. প্রয়াগ খ. কাশি

গ. কটক ঘ. কোলকাতা

১০. মেয়েদের বিয়ের প্রস্তাবে অর্জুনকাকার অনুভূতি হচ্ছে–

ক. বিপন্ন বোধ করা খ. বিব্রত হওয়া

গ. আপদ হওয়া ঘ. আনন্দ বোধ করা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

মানুষ মানুষের জন্য
জীবন জীবনের জন্য
একটু সহানুভূতি কি মানুষ
পেতে পারে না।

১১. উদ্দীপকের 'একটু সহানুভূতি' 'অর্জুন মণ্ডল' গল্পে কে দেখিয়েছিলেন?

ক. হারাধন বাবু খ. করিম মিয়া

গ. গল্পকথকের বাবা ঘ. সিভিল সার্জন

১২. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু প্রকাশ পেয়েছে নিচের যে বাক্যে–

ক. আপনি তো সবই জানেন, আপনি না থাকলে আমাকে কাঁচাই খেয়ে ফেলত শালারা।

খ. মাসখানেকের মধ্যেই তো কটক যেতে হবে তোমাকে।

গ. তার চেয়ে এতেই লেগে পড়। ঘ. তবু আমি পড়ব।

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ :

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম চব্বিশ পরগণার রাহুতা গ্রামে। তাঁর জীবন অত্যন্ত বৈচিত্র্যমণ্ডিত। তীব্র জ্ঞান ও কর্মস্পৃহা নিয়ে তিনি প্রথম জীবনের দরিদ্র দশা অতিক্রম করেন। প্রাথমিক জীবন অতিবাহিত হওয়ার পর প্রায় স্বশিক্ষিত হয়ে বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতা করেন। পরে পুলিশ বিভাগে চাকুরি গ্রহণ করে উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থানে দিনাতিপাত করেন। কালান্তরে সরকারের রাজস্ব বিভাগে যোগ দিয়ে দু'বার ইংল্যান্ড ও ইউরোপ ভ্রমণ করেন। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পরই তাঁর প্রকৃত সাহিত্যিক জীবন শুরু হয়। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় আজ বাঙলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ সাহিত্য রচয়িতা।

ক. অর্জুন মণ্ডল কোন সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন?

খ. 'বানপ্রস্থ অবলম্বন করাই ঠিক করেছেন শেষকালে।' –কেন? বুঝিয়ে বলুন।

গ. উদ্দীপকের ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'অর্জুন মণ্ডল' গল্পে কার সাদৃশ্য রয়েছে? –বিশ্লেষণ করুন।

ঘ. "যে কোন বয়সেই পড়াশোনা করা যায়, প্রয়োজন শুধু প্রবল ইচ্ছাশক্তির।" –উদ্দীপক ও 'অর্জুন মণ্ডল' গল্পের আলোকে মন্তব্যটি বিচার করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন-১

ক.

অর্জুন মণ্ডল জেলে সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন।

খ.

জীবনে কারও সঙ্গে বনিবনা হয়নি বলে অর্জুনকাকা বানপ্রস্থ অবলম্বন করা ঠিক করেছেন।

অর্জুনকাকা একজন স্বশিক্ষিত মানুষ। তিনি তার পরিবারকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরিবারের কেউ তার সহযাত্রী হয়নি। অর্জুনকাকার স্ত্রী মারা গেছেন। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তার প্র্যাকটিস করতেও ভালো লাগছিল না। মূর্খ জামাইদের সঙ্গে তার মতের মিল হয়নি। এমনকি নাতিরাও তার মনের মতো হয়নি। দুনিয়ার কারও সঙ্গে তার বনেনি। তাই শেষকালে অর্জুনকাকা বানপ্রস্থ অবলম্বন করাকেই শ্রেয় মনে করেছেন।

গ.

উদ্দীপকের ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'অর্জুন মণ্ডল' গল্পে অর্জুনকাকার সাদৃশ্য রয়েছে।

সাহস আর আত্মবিশ্বাস জীবনের অনেক কিছুই পাল্টে দিতে পারে। মানুষের মধ্যে যদি আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয় তবে সে আপন শক্তিতে আত্মমর্যাদায় বড় হতে পারে। ব্যক্তির ক্ষেত্রে আত্মমর্যাদাকে উপলব্ধি করতে পারলে তার বিকাশের যাবতীয় প্রতিবন্ধতা দূর হয়। এক সময় প্রবাহিত হয় আলোকের ঝরনা ধারা।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সাহিত্যিক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় স্বশিক্ষিত হয়ে বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। প্রথম জীবনে দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করলেও তাঁর মধ্যে তীব্র জ্ঞান ও কর্মস্পৃহা ছিল। কালান্তরে তিনি সরকারের পুলিশ ও রাজস্ব বিভাগে চাকুরি করেন। এভাবে তিনি জ্ঞানের আলোয় আলেকিত হয়ে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। 'অর্জুন মণ্ডল' গল্পেও অর্জুনকাকার আত্মপ্রতিষ্ঠার কাহিনি রয়েছে। হাসপাতালের একজন ডাক্তারের সংস্পর্শে এসে তার জীবনের মোড় ঘুরে যায়। স্বশিক্ষিত হয়ে একসময় তিনি কম্পাউন্ডারি পরীক্ষায় পাশ করেন। এভাবে অর্জুনকাকা মূর্খতার অন্ধকার ভেদ করে আলোর জগতে পা রাখতে সক্ষম হন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'অর্জুন মণ্ডল' গল্পের অর্জুনকাকার চরিত্রটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ.

পড়াশোনার ক্ষেত্রে বয়স কোনো বাধা নয়, প্রয়োজন শুধু প্রবল ইচ্ছাশক্তির।

অদম্য মনোবলই মানুষকে সাহসী করে তোলে। মানুষ সেই সাহসে বলীয়ান হয়ে সম্মুখ পানে এগিয়ে যায়। কোনো পরাশক্তিই তাকে পরাভূত পারে না। অব্যক্ত এই শক্তির আলোকে মানুষ নিজেকে যেমন আলোকিত করে, তেমনি চারপাশের অন্ধকারও দূর করতে সক্ষম হয় আপন আলোয়।

'অর্জুন মণ্ডল' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র অর্জুনকাকা জেলে সম্প্রদায়ের এবং তিনি চল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত নিরক্ষর ছিলেন। ঘটনাচক্রে হাসপাতালের একজন ডাক্তারের সহায়তায় তিনি অধিক বয়সে বিদ্যা অর্জনে আগ্রহী হন। পরিণত বয়সে স্কলারশিপ পেয়ে তিনি কটক হতে কম্পাউন্ডারি পরীক্ষায় পাশ করে জেলা বোর্ডের বিভিন্ন হাসপাতালে চাকুরি করেন। পুনরায় তিনি ষাট বৎসর বয়সে গল্পকথকের নিকট অ্যানাটমি, ফিজিওলজি ও ফার্মাকোলজি বিষয়ে জ্ঞান আহরণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অন্যদিকে উদ্দীপকের চরিত্র ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের জীবনও অত্যন্ত বৈচিত্র্যমণ্ডিত। তিনিও প্রাথমিক জীবন শেষে স্বশিক্ষিত হয়ে সরকারি চাকুরি লাভ করেন। অতঃপর চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করে সাহিত্য সাধনার মাধ্যমে বাঙলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ সাহিত্য রচয়িতা রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

উদ্দীপকের সাহিত্যিক ত্রৈলোক্যনাথ এবং 'অর্জুন মণ্ডল' গল্পের অর্জুনমণ্ডল উভয়েই স্বশিক্ষিত এবং সামাজিক ও আর্থিক প্রতিবন্ধকতাকে ডিঙ্গিয়ে বিদ্যা অর্জন করেছেন। চরিত্র দুটির ক্ষেত্রে বয়স কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার মূলে ছিল সাহস আর আত্মবিশ্বাস এবং ইচ্ছাশক্তি। অতএব, বলা যায়, মানুষ যে কোনো বয়সেই পড়াশোনা করতে পারে, শুধু প্রয়োজন হয় তার প্রবল ইচ্ছাশক্তির।

অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

এত পরিশ্রমের ফসল কিন্তু ওসমানের একার নয়। সে তো শুধু ভাগচাষি। জমির মালিক ওয়াজেদ চৌধুরী ঢাকায় বড় চাকরি করেন। দেশে রাখা গোমস্তা কড়ায় গণ্ডায় অর্ধেক ভাগ আদায় করে নেয়। মরশুমের সময় তাঁর ছেলে ইউসুফ ঢাকা থেকে আসে। ধান পাট বিক্রি করে টাকা নিয়ে আবার ঢাকা চলে যায়। গত বছর বাইনের সময় ও একা এসেছিল। এসে কাগজে কাগজে টিপসই নিয়ে গেছে ভাগচাষিদের। এর আগে জমির বিলি-ব্যবস্থা মুখেমুখেই চলতো।

ক. অর্জুনকাকা গল্পকথকের নিকট কোন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে চেয়েছেন?

খ. "উঃ বিদ্যার কী প্রতাপ!" –কেন? বুঝিয়ে বলুন।

গ. উদ্দীপকের ওয়াজেদ চৌধুরীর সঙ্গে 'অর্জুন মণ্ডল' গল্পে কার সাদৃশ্য রয়েছে? –আলোচনা করুন।

ঘ. "সামন্ত-সমাজে শোষকের চরিত্র একই, বদলায় শুধু তার রূপ।" –উদ্দীপক ও 'অর্জুন মণ্ডল' গল্পের আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক ২. ক ৩. ক ৪. গ ৫. গ ৬. ক ৭. ক ৮. ক ৯. গ ১০. ক ১১. গ ১২. ক

প্রাগৈতিহাসিক

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূমিকা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য গল্প-সংকলন *প্রাগৈতিহাসিক* থেকে 'প্রাগৈতিহাসিক' নামগল্পটি সংকলিত হয়েছে। গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ সালে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতি জনপ্রিয় গল্প 'প্রাগৈতিহাসিক'। গল্পটি পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। জৈবচেতনা ও বেঁচে থাকার অন্তহীন আকাঙ্ক্ষায় 'প্রাগৈতিহাসিক' একই সঙ্গে রহস্যময় জীবনসত্য, আদিম দেহকাজ, নিষ্ঠুর বাস্তবতা এবং অতল-অসীম অস্তিত্ববাসনার শিল্প প্রতিমা। বাংলা ছোটগল্পের ধারায় এক অসামান্য নির্মাণ 'প্রাগৈতিহাসিক'।

সাধারণ উদ্দেশ্য

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পটি পাঠ করে আপনি–

- ছোটগল্প হিসেবে 'প্রাগৈতিহাসিক' –এর সার্থকতা বিচার করতে পারবেন।
- গল্পের নাম কেন 'প্রাগৈতিহাসিক' হল, তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ভিখু চরিত্র বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনবাস্তবতার চিত্র অঙ্কন করতে পারবেন।

পাঠ–১

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- ভিখুর চরিত্রের কতিপয় বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মূল আখ্যানে পেহ্লাদ-উপকাহিনির গুরুত্ব আলোচনা করতে পারবেন।
- ভিখুর জীবনের বিপর্যয় ও বাঁক-পরিবর্তন বর্ণনা করতে পারবেন ।

মূলপাঠ

সমস্ত বর্ষাকালটা ভিখু ভয়ানক কষ্ট পাইয়াছে। আষাঢ় মাসের প্রথমে বসন্তপুরের বৈকুণ্ঠ সাহার গদিতে ডাকাতি করিতে গিয়া তাহাদের দলকে-দল ধরা পড়িয়া যায়। এগারজনের মধ্যে কেবল ভিখুই কাঁধে একটা বর্শার খোঁচা খাইয়া পলাইতে পারিয়াছিল। রাতারাতি দশ মাইল দূরের মাথা-ভাঙা পুলটার নিচে পৌঁছিয়া অর্ধেকটা শরীর কাদায় ডুবাইয়া শরবনের মধ্যে দিনের বেলাটা লুকাইয়া ছিল। রাত্রে আরো ন ক্রোশ পথ হাঁটিয়া একেবারে পেহ্লাদ বাগ্‌দীর বাড়ি চিতলপুরে।

পেহ্লাদ তাহাকে আশ্রয় দেয় নাই।

কাঁধটা দেখাইয়া বলিয়াছিল, 'ঘাওখান সহজ লয় স্যাঙ্গাত। উটি পাকব। গা ফুলব। জানাজানি হইয়া গেলে আমি কনে যামু? খুনটো যদি না করতিস'

'তরেই খুন করতে মন লইতেছে পেহ্লাদ।'

‘এই জনমে লা, স্যাঙ্গাত।’

বন কাছেই ছিল, মাইল পাঁচেক উত্তরে। ভিখু অগত্যা বনেই আশ্রয় লইল। পেহ্লাদ নিজে বাঁশ কাটিয়া বনের একটা দুর্গম অংশে সিনজুরি গাছের নিবিড় ঝোপের মধ্যে তাহাকে একটা মাচা বাঁধিয়া দিল। তালপাতা দিয়া একটা আচ্ছাদনও করিয়া দিল। বলিল, ‘বাদলায় বাঘটাঘ সব পাহাড়ের ওপরে গেছে গা। সাপে যদি না কাটে তো আরাম কইরাই থাকবি ভিখু।’

‘খামু কী?’

‘চিঁড়া-গুড় দিলাম যে? দুদিন বাদে বাদে ভাত লইয়া আসুম; রোজ আইলে মাইনসে সন্দ করব।’

কাঁধের ঘা-টা লতাপাতা দিয়া বাঁধিয়া আবার আসিবার আশ্বাস দিয়া পেহ্লাদ চলিয়া গেল। রাত্রে ভিখুর জ্বর আসিল। পরদিন টের পাওয়া গেল পেহ্লাদের কথাই ঠিক, কাঁধের ঘা ভিখুর দুনাইয়া উঠিয়াছে। ডান হাতটি ফুলিয়া ঢোল হইয়া গিয়াছে এবং হাতটি তাহার নাড়িবার সামর্থ্য নাই।

বর্ষাকালে যে বনে বাঘ বাস করিতে চায় না এমনি অবস্থায় সেই বনে জলে ভিজিয়া মশা ও পোকার উৎপাত সহিয়া, দেহের কোনো না কোনো অংশ হইতে ঘণ্টায় একটি করিয়া জোঁক টানিয়া ছাড়াইয়া জ্বরে ও ঘায়ের ব্যথায় ধুঁকিতে ধুঁকিতে ভিখু দুদিন দুরাত্রি সঙ্কীর্ণ মাচাটুকুর ওপর কাটাইয়া দিল। বৃষ্টির সময় ছাট লাগিয়া সে ভিজিয়া গেল, রোদের সময় ভাপসা গাঢ় গুমোটে সে হাঁপাইয়া শ্বাস টানিল, পোকার অত্যাচারে দিবারাত্রি তাহার এক মুহূর্তের স্বস্তি রহিল না। পেহ্লাদ কয়েকটা বিড়ি দিয়া গিয়াছিল, সেগুলি ফুরাইয়া গিয়াছে। তিন-চার দিনের মতো চিঁড়া আছে বটে কিন্তু গুড় একটুও নাই। গুড় ফুরাইয়াছে, কিন্তু গুড়ের লোভে যে লাল পিঁপড়াগুলি ঝাঁক বাঁধিয়া আসিয়াছিল তাহারা এখনো মাচার উপরে ভিড় করিয়া আছে। ওদের হতাশার জ্বালা ভিখুই অবিরত ভোগ করিতেছে সর্বাঙ্গে।

মনে মনে পেহ্লাদের মৃত্যু কামনা করিতে করিতে ভিখু তবু বাঁচিবার জন্য প্রাণপণে যুঝিতে লাগিল। যেদিন পেহ্লাদের আসিবার কথা সেদিন সকালে কলসির জলটাও তাহার ফুরাইয়া গেল। বিকাল পর্যন্ত পেহ্লাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া তৃষ্ণার পীড়ন আর সহিতে না পারিয়া কলসিটা লইয়া সে যে কত কষ্টে খানিক দূরের নালা হইতে আধ কলসি জল ভরিয়া আনিয়া আবার মাচায় উঠিল তাহার বর্ণনা হয় না; অসহ্য ক্ষুধা পাইলে চিঁড়া চিবাইয়া সে পেট ভরাইল। একহাতে ক্রমাগত পোকা ও পিঁপড়াগুলি টিপিয়া মারিল। বিষাক্ত রস শুষিয়া লইবে বলিয়া জোঁক ধরিয়া নিজেই ঘায়ের চারিদিকে লাগাইয়া দিল। সবুজ রঙের একটা সাপকে একবার মাথার কাছে সিনজুরি গাছের পাতার ফাঁকে উঁকি দিতে দেখিয়া পুরা দুঘণ্টা লাঠি হাতে সেদিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল এবং তাহার পর দু-এক ঘণ্টা অন্তরই চারিদিকে ঝোপে ঝপাঝপ লাঠির বাড়ি দিয়া যথাসাধ্য শব্দ করিয়া সাপ তাড়াইতে লাগিল।

মরিবে না। সে কিছুতেই মরিবে না। বনের পশু যে অবস্থায় বাঁচে না সেই অবস্থায়, মানুষ সে বাঁচিবেই।

পেহ্লাদ গ্রামান্তরে কুটুমবাড়ি গিয়াছিল। পরদিনও সে আসিল না। কুটুমবাড়ির বিবাহোৎসবে তাড়ি টানিয়া বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া রহিল। বনের মধ্যে ভিখু কীভাবে দিনরাত্রি কাটাইতেছে তিন দিনের মধ্যে সে কথা একবার তাহার মনেও পড়িল না।

ইতিমধ্যে ভিখুর ঘা পচিয়া উঠিয়া লালচে রস গড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। শরীরও তাহার অল্প অল্প ফুলিয়াছে। জ্বরটা একটু কমিয়াছে, কিন্তু সর্বাঙ্গের অসহ্য বেদনা দম-ছুটানো তাড়ির নেশার মতোই ভিখুকে আচ্ছন্ন, অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। সে আর এখন ক্ষুধা-তৃষ্ণা অনুভব করিতে পারে না। জোঁকেরা তাহার রক্ত শুষিয়া শুষিয়া কচি পটোলের মতো ফুলিয়া উঠিয়া আপনা হইতেই নিচে খসিয়া পড়িয়া যায়, সে টেরও পায় না। পায়ের ধাক্কায় জলের কলসিটা এক সময় নিচে পড়িয়া ভাঙিয়া যায়, বৃষ্টির জলে ভিজিয়া পুঁটুলির মধ্যে চিঁড়াগুলি পচিতে আরম্ভ করে, রাত্রে তাহার গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া মাচার আশপাশে শিয়াল ঘুরিয়া বেড়ায়।

কুটুমবাড়ি হইতে ফিরিয়া বিকালের দিকে ভিখুর খবর লইতে গিয়া ব্যাপার দেখিয়া পেহ্লাদ গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িল। ভিখুর জন্য একবাটি ভাত ও কয়েকটি পুঁটিমাছ ভাজা আর একটু পুঁই-চচ্চড়ি সে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত ভিখুর কাছে বসিয়া থাকিয়া ওগুলি সে নিজেই খাইয়া ফেলিল। তারপর বাড়ি গিয়া বাঁশের একটা ছোট মই এবং তাহার বোনাই ভরতকে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিল।

মইয়ে শোয়াইয়া তাহারা দুজনে ভিখুকে বাড়ি লইয়া গেল। ঘরের মাচার ওপর খড় বিছাইয়া শয্যা রচনা করিয়া তাহাকে শোয়াইয়া রাখিল।

আর এমনি শক্তপ্রাণ ভিখুর যে শুধু এই আশ্রয়টুকু পাইয়াই বিনা চিকিৎসায় ও এক রকম বিনা যত্নেই এক মাস মুমূর্ষু অবস্থায় কাটাইয়া সে ক্রমে ক্রমে নিশ্চিত মরণকে জয় করিয়া ফেলিল। কিন্তু ডান হাতটি তাহার আর ভালো হইল না। গাছের মরা ডালের মতো শুকাইয়া গিয়া অবশ অকর্মণ্য হইয়া পড়িল। প্রথমে অতি কষ্টে হাতটা সে একটু নাড়িতে পারিত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ক্ষমতাটুকুও তাহার নষ্ট হইয়া গেল।

কাঁধের ঘা শুকাইয়া আসিবার পর বাড়িতে বাহিরের লোক কেহ উপস্থিত না থাকিলে ভিখু তাহার একটি মাত্র হাতের সাহায্যে মধ্যে মধ্যে বাঁশের মই বাহিয়া নিচে নামিতে লাগিল এবং একদিন সন্ধ্যার সময় এক কাণ্ড করিয়া বসিল।

পেহ্লাদ সে সময় বাড়ি ছিল না, ভরতের সঙ্গে তাড়ি গিলিতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। পেহ্লাদের বোন গিয়াছিল ঘাটে। পেহ্লাদের বৌ ছেলেকে ঘরে শোয়াইতে আসিয়া ভিখুর চাহনি দেখিয়া তাড়াতাড়ি পলাইয়া যাইতেছিল, ভিখু তাহার একটা হাত চাপিয়া ধরিল।

কিন্তু পেহ্লাদের বৌ বাগ্‌দীর মেয়ে। দুর্বল শরীরে বাঁ হাতে তাহাকে আয়ত্ত করা সহজ নয়। এক ঝটকায় হাত ছাড়াইয়া সে গাল দিতে দিতে চলিয়া গেল। পেহ্লাদ বাড়ি ফিরিলে সব বলিয়া দিল।

তাড়ির নেশায় পেহ্লাদের মনে হইল, এমন নেমকহারাম মানুষটাকে একেবারে খুন করিয়া ফেলাই কর্তব্য। হাতের মোটা বাঁশের লাঠিটা বৌয়ের পিঠে এক ঘা বসাইয়া দিয়া ভিখুর মাথা ফাটাইতে গিয়া নেশার মধ্যেও কিন্তু টের পাইতে বাকি রহিল না যে কাজটা যত বড় কর্তব্যই হোক সম্ভব একেবারেই নয়। ভিখু তাহার ধারালো দা-টি বাঁ হাতে শক্ত করিয়া বাগাইয়া ধরিয়া আছে। সুতরাং খুনোখুনির পরিবর্তে তাহাদের মধ্যে কিছু অশ্লীল কথার আদান-প্রদান হইয়া গেল।

শেষে পেহ্লাদ বলিল, 'তোর লাইগ্যা আমার সাত টাকা খরচ গেছে, টাকাটা দে, দিয়া বাইর' আমার বাড়ি থেইকা, –দূর হ।'

ভিখু বলিল, 'আমার কোমরে একটা বাজু বাইন্ধা রাখছিলাম, তুই চুরি করছস। আগে আমার বাজু ফিরাইয়া দে, তবে যামু।'

'তোর বাজুর খপর জানে কেডা রে?'

'বাজু দে কইলাম পেহ্লাদ, ভালো চাস তো! বাজু না দিলি সা-বাড়ির মেজোকত্তার মতো গলাডা তোর একখান কোপেই দুই ফাঁক কইরা ফেলুম, এই তোরে আমি কইয়া রাখলাম। বাজু পালি আমি অখনি যামু গিয়া।'

কিন্তু বাজু ভিখু ফেরত পাইল না। তাহাদের বিবাদের মধ্যে ভরত আসিয়া পড়ায় দুজনে মিলিয়া ভিখুকে তাহারা কায়দা করিয়া ফেলিল। পেহ্লাদের বাহুমূলে একটা কামড় বসাইয়া দেওয়া ছাড়া দুর্বল ও পঙ্গু ভিখু আর বিশেষ কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না। পেহ্লাদ ও তাহার বোনাই তাহাকে মারিতে মারিতে আধমরা করিয়া ফেলিয়া বাড়ির বাহির করিয়া দিল। ভিখুর শুকাইয়া-আসা ঘা ফাটিয়া রক্ত পড়িতেছিল, হাত দিয়া রক্ত মুছিতে মুছিতে ধুঁকিতে ধুঁকিতে সে চলিয়া গেল। রাত্রির অন্ধকারে সে কোথায় গেল কেহই তাহা জানিতে পারিল না বটে, কিন্তু দুপুর রাতে পেহ্লাদের ঘর জ্বলিয়া উঠিয়া বাগ্‌দীপাড়ায় বিষম হৈ চৈ বাধাইয়া দিল।

পেহ্লাদ কপাল চাপড়াইয়া বলিতে লাগিল, 'হায় সব্বনাশ, হায় সব্বনাশ! ঘরকে আমার শনি আইছিল, হায় সব্বনাশ!'

কিন্তু পুলিশের টানাটানির ভয়ে মুখ ফুটিয়া বেচারা ভিখুর নামটা পর্যন্ত করিতে পারিল না।

সেই রাত্রি হইতে ভিখুর আদিম, অসভ্য জীবনের দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হইল। চিতলপুরের পাশে একটা নদী আছে। পেহ্লাদের ঘরে আগুন দিয়া আসিয়া একটা জেলেডিঙি চুরি করিয়া ভিখু নদীর স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল। লগি ঠেলিবার সামর্থ্য তাহার ছিল না, একটা চ্যাপটা বাঁশকে হালের মতো করিয়া ধরিয়া রাখিয়া সে সমস্ত রাত কোনোরকমে নৌকার মুখ সিধা রাখিয়াছিল। সকাল হওয়ার আগে শুধু স্রোতের টানে সে বেশিদূর আগাইতে পারে নাই।

ভিখুর মনে আশঙ্কা ছিল ঘরে আগুন দেওয়ার শোধ লইতে পেহ্লাদ হয়তো তাহার নামটা প্রকাশ করিয়া দিবে, মনের জ্বালায় নিজের অসুবিধার কথাটা ভাবিবে না। পুলিশ বহুদিন যাবত তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে, বৈকুণ্ঠ সাহার বাড়িতে খুনটা হওয়ার ফলে চেষ্টা তাহাদের বাড়িয়াছে বৈ কমে নাই। পেহ্লাদের কাছে খবর পাইলে পুলিশ আশেপাশে চারিদিকেই তাহার খোঁজ করিবে। বিশ-ত্রিশ মাইলের মধ্যে লোকালয়ে মুখ দেখানো তাহার পক্ষে বিপদের কথা। কিন্তু ভিখু তখন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। কাল বিকাল হইতে সে কিছু খায় নাই। দুজন জোয়ান মানুষের হাতে বেদম মার খাইয়া এখনো দুর্বল শরীরটা তাহার ব্যথায় আড়ষ্ট হইয়া আছে। ভোর-ভোর মহকুমা শহরের ঘাটের সামনে পৌঁছিয়া সে ঘাটে নৌকা লাগাইল। নদীর জলে ডুবিয়া ডুবিয়া স্নান করিয়া গায়ের রক্তের চিহ্ন ধুইয়া ফেলিয়া শহরের ভিতর প্রবেশ করিল। ক্ষুধায় সে চোখে অন্ধকার

দেখিতেছিল। একটি পয়সাও তাহার সঙ্গে নাই যে মুড়ি কিনিয়া খায়। বাজারের রাস্তায় প্রথম যে ভদ্রলোকটির সঙ্গে দেখা হইল তাঁহারই সামনে হাত পাতিয়া সে বলিল, 'দুটো পয়সা দিবান কর্তা?'

তাহার মাথার জটবাঁধা চাপ-চাপ রুক্ষ ধূসর চুল, কোমরে জড়ানো মাটির মতো ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়া, আর দড়ির মতো শীর্ণ দোদুল্যমান হাতটি দেখিয়া ভদ্রলোকটির বুঝি দয়াই হইল। তিনি তাহাকে একটি পয়সা দান করিলেন।

ভিখু বলিল– 'একটা দিলেন বাবু? আর একটা দেন।'

ভদ্রলোক চটিয়া বলিলেন– 'একটা দিলাম, তাতে হল না, ভাগ্।'

এক মুহূর্তের জন্য মনে হইল ভিখু বুঝি তাহাকে একটা বিশ্রী গালই দিয়া বসে। কিন্তু সে আত্মসংবরণ করিল। গাল দেওয়ার বদলে আরক্ত চোখে তাহার দিকে একবার কটমট করিয়া তাকাইয়া সামনের মুড়িমুড়কির দোকানে গিয়া পয়সাটা দিয়া মুড়ি কিনিয়া গোগ্রাসে গিলিতে আরম্ভ করিল।

সেই হইল তাহার ভিক্ষা করিবার হাতে খড়ি।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

কায়দা করা– আয়ত্ত করা, ধরে ফেলা। **ক্রোশ–** দূরত্বের পরিমাপবাচক একক; মাইলের কিছু বেশি পথ, ৮০০০ হাত পরিমাণ দূরত্ব। **গোগ্রাস–** প্রায়শ্চিত্যের পর গরুর মুখে ঘাস দানের ধর্মীয় প্রথা, গরুর মতো বড় গ্রাসে দ্রুত গলাধঃকরণ। **দুনাইয়া উঠিয়াছে–** পেকে উঠেছে। **নেমকহারাম–** কৃতঘ্ন, উপকার পেয়েও যে তা অস্বীকার করে বা উপকারীর অপকার করে; **বাগ্‌দী–** বর্ণাশ্রমের বাইরে কৃষিজীবী অন্ত্যজ হিন্দু সম্প্রদায়, জেলে। **বাজু–** বাহু বা কোমরের অলঙ্কারবিশেষ। **বোনাই–** ভগ্নিপতি, বোনের স্বামী। **যুঝিতে–** যুদ্ধ করতে। **লয়–** নয়, বীরভূম-বর্ধমান অঞ্চলে শব্দের শুরুতে 'ন' ধ্বনি 'ল'-এর মতো উচ্চারিত হয়। **শরবন–** নল-খাগড়া জাতীয় বন, এক জাতীয় তৃণের বন। **সন্দ–** সন্দেহ। **সা-বাড়ির–** সাহা বাড়ির। **স্যাঙ্গাত–** দোস্ত, বন্ধু, সহচর, সহকর্মী।

সারসংক্ষেপ :

বহু ডাকাতি, লুণ্ঠন, নারী-নির্যাতন করলেও কখনও কঠিন বিপদে পড়েনি ভিখু। কিন্তু বসন্তপুরের বৈকুণ্ঠ সাহার গদিতে ডাকাতি করতে গিয়ে দলের এগার জনের দশজনই ধরা পড়ে, ভিখুই কেবল কাঁধে বর্শার খোঁচা খেয়েও পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। আশ্রয় নেয় সে ন' ক্রোশ দূরে চিতলপুর পেহ্লাদ বাদীর বাড়িতে। পুলিশের ভয়ে পেহ্লাদ তাকে বাড়িতে না রেখে বনের মধ্যে মাচা বেঁধে থাকতে দিল। বর্ষাকালে জল-রোদ-বৃষ্টিতে অনাহারে অর্ধাহারে কেটে যায় ভিখুর জীবনের সবচেয়ে কঠিন ও যন্ত্রণাময় কয়েকটা দিন। ইতোমধ্যে ভিখুর আঘাতপ্রাপ্ত বাহুতে পচন ধরে। অবস্থা শোচনীয় দেখে পেহ্লাদ তাকে বাড়িতে নিয়ে আসে, সেবা-যত্ন ও শুশ্রূষায় সুস্থ করে তোলে ভিখুকে। যদিও তাঁর ডান হাত কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, তবু ভিখুর আদিম পাশব প্রবৃত্তির কোনো পরিবর্তন ঘটে না। এক সন্ধ্যায় পেহ্লাদের অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রীর দিকে আদিম হাত বাড়িয়ে দেয় ভিখু। পরিণতিতে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয় পেহ্লাদ। রাতের আঁধারে পেহ্লাদের ঘরে আগুন দিয়ে চিতলপুর ছাড়ে ভিখু। শুরু হয় আদিম-অসভ্য অমার্জিত জীবনের দ্বিতীয় পর্ব। ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১."ঘরকে আমার শনি আইছিল।" –এখানে 'শনি' কে?

ক. ভরত   খ. পেহ্লাদ
গ. ভিখু   ঘ. বৈকুণ্ঠ

২. পেহ্লাদ ভিখুকে বাড়িতে আশ্রয় দেয়নি কেন?

ক. জানাজানি হবার ভয়ে   খ. ভিখু ডাকাত বলে
গ. বৈকুণ্ঠ সাহাকে খুন করায়   ঘ. সংসারে ব্যয় বেড়ে যাবে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

মোহাম্মদী বেগকে পরম মমতায় প্রাসাদে আশ্রয় দিয়েছিলেন নবাব আলী বর্দী খাঁ। সন্তান স্নেহে তাকে বড় করে তুলেছিলেন। কিন্তু পলাশির যুদ্ধে সিরাজের পতন ঘটলে সেই মোহাম্মদী বেগই ইংরেজদের নির্দেশে নবাবের আদরের নাতি সিরাজকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

৩. উদ্দীপকের মোহাম্মদী বেগের সঙ্গে ‘প্রাগৈতিহাসিক’ গল্পে কার সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. ভিখু
খ. ভরত
গ. পেহ্লাদ
ঘ. রাখু

৪. এরূপ সাদৃশ্যের কারণ–

ক. ভিখুর নেমকহারামি
খ. পেহ্লাদের বাজু চুরি
গ. ভরতের মারধোর
ঘ. পুলিশের টানাটানির ভয়

পাঠ-২

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- ভিখুর চরিত্রের কতিপয় বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ভিখুর ভিক্ষা করার কৌশল আলোচনা করতে পারবেন।
- পাঁচীর প্রতি ভিখুর আকর্ষণ ও পাঁচীকে পাবার জন্য ভিখুর নানামাত্রিক আচরণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

কয়েক দিনের ভিতরেই সে পৃথিবীর বহু পুরাতন ব্যবসাটির এই প্রকাশ্যতম বিভাগের আইনকানুন সব শিখিয়া ফেলিল। আবেদনের ভঙ্গি ও ভাষা তাহার জন্ম ভিখারির মতো আয়ত্ত হইয়া গেল। শরীর এখন আর সে একেবারেই সাফ করে না, মাথার চুল তাহার ক্রমেই জট বাঁধিয়া দলা-দলা হইয়া যায় এবং তাহাতে অনেকগুলি উকুন-পরিবার দিনের পর দিন বংশবৃদ্ধি করিয়া চলে। ভিখু মাঝে মাঝে খ্যাপার মতো দুই হাতে মাথা চুলকায় কিন্তু বাড়তি চুল কাটিয়া ফেলিতে ভরসা পায় না। ভিক্ষা করিয়া সে একটি ছেঁড়া কোট পাইছে, কাঁধের ক্ষতচিহ্নটা ঢাকিয়া রাখিবার জন্য দারুণ গুমোটের সময়েও কোটটা সে গায়ে চাপাইয়া রাখে। শুকনো হাতখানা তাহার ব্যবসার সবচেয়ে জোরালো বিজ্ঞাপন, এই অঙ্গটি ঢাকিয়া রাখিলে তাহার চলে না। কোটের ডানদিকের হাতাটি সে তাই বগলের কাছ হইতে ছিঁড়িয়া বাদ দিয়াছে। একটি টিনের মগ ও একটা লাঠিও সে সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে।

সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাজারের কাছে রাস্তার ধারে একটা তেঁতুলগাছের নিচে বসিয়া সে ভিক্ষা করে। সকালে এক পয়সার মুড়ি খাইয়া নেয়, দুপুরে বাজারের খানিক তফাতে একটা পোড়ো বাগানের মধ্যে ঢুকিয়া বটগাছের নিচে ইটের উনুনে মেটে হাঁড়িতে ভাত রান্না করে, মাটির মালসায় কোনোদিন রাঁধে ছোট মাছ, কোনোদিন তরকারি। পেট ভরিয়া খাইয়া বটগাছটাতেই হেলান দিয়া বসিয়া আরামে বিড়ি টানে। তারপর আবার তেঁতুলগাছটার নিচে গিয়া বসে।

সারাটা দিন শ্বাস-টানা কাতরানির সঙ্গে সে বলিয়া যায় : হেই বাবা একটা পয়সা : আমায় দিলে ভগবান দিবে : হেই বাবা একটা পয়সা।

অনেক প্রাচীন বুলির মতো ‘ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ’ শ্লোকটা আসলে অসত্য। সারাদিনে ভিখুর সামনে দিয়া হাজার-দেড় হাজার লোক যাতায়াত করে এবং গড়ে প্রতি পঞ্চাশ জনের মধ্যে একজন তাহাকে পয়সা অথবা আধলা দেয়। আধলার সংখ্যা বেশি হইলেও সারাদিনে ভিখুর পাঁচ-ছ আনা রোজগার হয়, কিন্তু সাধারণত তাহার উপার্জন আট আনার কাছাকাছি থাকে। সপ্তাহে এখানে দুদিন হাট বসে। হাটবারের উপার্জন তাহার একটি পুরা টাকার নিচে নামে না।

এখন বর্ষাকাল অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। নদীর দুই তীর কাশে সাদা হইয়া উঠিয়াছে। নদীর কাছেই বিন্নু মাঝির বাড়ির পাশে ভাঙা চালাটা ভিখু মাসিক আট আনায় ভাড়া করিয়াছে। রাত্রে সে ওখানেই শুইয়া থাকে। ম্যালেরিয়ায় মৃত এক ব্যক্তির জীর্ণ কিন্তু পুরু একটি কাঁথা সংগ্রহ করিয়াছে, লোকের বাড়ির খড়ের গাদা হইতে চুরি করিয়া আনা খড় বিছাইয়া তাহার উপর কাঁথাটি পাতিয়া সে আরাম করিয়া ঘুমায়। মাঝে মাঝে শহরের ভিতরে গৃহস্থবাড়িতে ভিক্ষা করিতে গিয়া সে কয়েকখানা ছেঁড়া কাপড় পাইয়াছে। তাই পুঁটলি করিয়া বালিশের মতো ব্যবহার করে। রাত্রে নদীর জোলো-বাতাসে শীত করিতে থাকিলে পুঁটলি খুলিয়া একটি কাপড় গায়ে জড়াইয়া লয়।

সুখে থাকিয়া এবং পেট ভরিয়া খাইয়া কিছুদিনের মধ্যে ভিখুর দেহে পূর্বের স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিল। তাহার ছাতি ফুলিয়া উঠিল, প্রত্যেকটি অঙ্গ সঞ্চালনে হাতের ও পিঠের মাংসপেশি নাচিয়া উঠিতে লাগিল। অবরুদ্ধ শক্তির উত্তেজনায় ক্রমে ক্রমে তাহার মেজাজ উদ্ধত ও অসহিষ্ণু হইয়া পড়িল। অভ্যস্ত বুলি আওড়াইয়া কাতরভাবেই সে এখনো ভিক্ষা চায় কিন্তু ভিক্ষা না পাইলে তাহার ক্রোধের সীমা থাকে না। পথে লোকজন না থাকিলে তাহার প্রতি উদাসীন পথিককে সে অশ্লীল গাল দিয়া বসে। এক পয়সার জিনিস কিনিয়া ফাউ না পাইলে দোকানিকে মারিতে ওঠে। নদীর ঘাটে মেয়েরা স্নান করিতে নামিলে ভিক্ষা চাহিবার ছলে জলের ধারে গিয়া দাঁড়ায়। মেয়েরা ভয় পাইলে সে খুশি হয় এবং সরিয়া যাইতে বলিলে নড়ে না, দাঁত বাহির করিয়া দুর্বিনীত হাসি হাসে।

রাত্রে স্বরচিত শয্যায় সে ছটফট করে।

নারী-সঙ্গহীন এই নিরুৎসব জীবন আর তার ভালো লাগে না। অতীতের উদ্দাম ঘটনাবহুল জীবনটির জন্য তাহার মন হাহাকার করে।

তাড়ির দোকানে ভাঁড়ে ভাঁড়ে তাড়ি গিলিয়া সে হল্লা করিত, টলিতে টলিতে বাসির ঘরে গিয়া উন্মত্ত রাত্রি যাপন করিত, আর মাঝে মাঝে দল বাঁধিয়া গভীর রাত্রে গৃহস্থের বাড়ি চড়াও হইয়া সকলকে মারিয়া কাটিয়া টাকা ও গহনা লুটিয়া রাতারাতি উধাও হইয়া যাইত। স্ত্রীর চোখের সামনে স্বামীকে বাঁধিয়া মারিলে তাহার মুখে যে অবর্ণনীয় ভাব দেখা দিত, পুত্রের অঙ্গ হইতে ফিনকি দিয়া রক্ত ছুটিলে মা যেমন করিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিত; মশালের আলোয় সে দৃশ্য দেখা আর আর্তনাদ শোনার চেয়ে উন্মাদনাকর নেশা জগতে আর কী আছে? পুলিশের ভয়ে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পলাইয়া বেড়াইয়া আর বনে-জঙ্গলে লুকাইয়া থাকিয়াও যেন তখন সুখী ছিল। তাহার দলের অনেকেই বারবার ধরা পড়িয়া জেল খাটিয়াছে কিন্তু জীবনে একবারের বেশি পুলিশ তাহার নাগাল পায় নাই। রাখু বাগ্‌দীর সঙ্গে পানাহার শ্রীপতি বিশ্বাসের বোনটাকে যেবার সে চুরি করিয়াছিল সেইবার সাত বছরের জন্য তাহার কয়েদ হইয়াছিল, কিন্তু দুবছরের বেশি কেহ তাহাকে জেলে আটকাইয়া রাখিতে পারে নাই। এক বর্ষার সন্ধ্যায় জেলের প্রাচীর ডিঙাইয়া সে পলাইয়াছিল। তারপর একা সে গৃহস্থবাড়িতে ঘরের বেড়া কাটিয়া চুরি করিয়াছে, দিনদুপুরে পুকুরঘাটে একাকিনী গৃহস্থবধূর মুখ চাপিয়া গলার হার, হাতের বালা খুলিয়া লইয়াছে, রাখুর বৌকে সঙ্গে নিয়া নোয়াখালী হইয়া সমুদ্র ডিঙাইয়া পাড়ি দিয়াছে একেবারে হাতিয়ায়। ছ মাস পরে রাখুর বৌকে হাতিয়ায় ফেলিয়া আসিয়া পরপর তিনবার তিনটা দল করিয়া দূরে দূরে কত গ্রামে যে ডাকাতি করিয়া বেড়াইয়াছে তাহার সবগুলির নামও এখন তাহার স্মরণ নাই। তারপর এই সেদিন বৈকুণ্ঠ সাহার মেজ ভাইটার গলাটা সে দায়ের এক কোপে দু ফাঁক করিয়া দিয়া আসিয়াছে।

কী জীবন তাহার ছিল, এখন কী হইয়াছে!

মানুষ খুন করিতে যাহার ভালো লাগিত সে আজ ভিক্ষা না দিয়া চলিয়া গেলে পথচারীকে একটি টিটকারি দেওয়ার মধ্যে মনের জ্বালা নিঃশেষ করে। দেহের শক্তি তাহার এখনো তেমনি অক্ষুণ্ণ আছে। সে শক্তি প্রয়োগ করিবার উপায়টাই তাহার নাই। কত দোকানে গভীর রাত্রে সামনে টাকার থোক সাজাইয়া একা বসিয়া দোকানি হিসাব মেলায়, বিদেশগত কত পুরুষের গৃহে মেয়েরা থাকে একা। এদিকে ধারালো একটা অস্ত্র হাতে ওদের সামনে হুমকি দিয়া পড়িয়া একদিনে বড়লোক হওয়ার পরিবর্তে বিন্নু মাঝির চালাটার নিচে সে চুপচাপ শুইয়া থাকে।

ডান হাতটাতে অন্ধকারে হাত বুলাইয়া ভিখুর আফসোসের সীমা থাকে না। সংসারের অসংখ্য ভীরু ও দুর্বল নরনারীর মধ্যে এত বড় বুকের পাটা আর এমন একটা জোরালো শরীর নিয়া শুধু একটা হাতের অভাবে সে যে মরিয়া আছে! এমন কপালও মানুষের হয়?

তবুও এ দুর্ভাগ্য সে সহ্য করিতে পারে। আফসোসেই নিবৃত্তি। একা ভিখু আর থাকিতে পারে না।

বাজারে ঢুকিবার মুখেই একটি ভিখারিনী ভিক্ষা করিতে বসে। বয়স তাহার বেশি নয়, দেহের বাঁধুনিও বেশ আছে। কিন্তু একটা পায়ে হাঁটুর নিচ হইতে পাতা পর্যন্ত তাহার থকথকে তৈলাক্ত ঘা।

এই ঘায়ের জোরে সে ভিখুর চেয়ে বেশি রোজগার করে। সেজন্য ঘা-টিকে সে বিশেষ যত্নে সারিতে দেয় না।

ভিখু মধ্যে মধ্যে গিয়া তাহার কাছে বসে। বলে, 'ঘা-টি সারব না, লয়?'

ভিখারিনী বলে, 'খুব! ওষুদ দিলে অখনি সারে।'

ভিখু সাগ্রহে বলে, 'সারা তবে, ওষুদ দিয়ে চটপট সারাইয়া ল। ঘা সারলে তোর আর ভিক্ মাগতি অইবো না, –জানস? আমি তোরে রাখুম।'

'আমি থাকলি'ত।'

'ক্যান? থাকবি না ক্যান? খাওয়ামু পরামু, আরামে রাখুম, পায়ের পরনি পা দিয়া গাট হইয়া বইয়া থাকবি। না করস্ তুই কিয়ের লেগে?'

অত সহজে ভুলিবার মেয়ে ভিখারিনী নয়। খানিকটা তামাকপাতা মুখে গুঁজিয়া সে বলে, 'দুদিন বাদে মোরে যখন তুই খেদাইয়া দিবি, ঘা মুই তখন পামু কোয়ানে?'

ভিখু আজীবন একনিষ্ঠতার প্রতিজ্ঞা করে, সুখে রাখিবার লোভ দেখায়। কিন্তু ভিখারিনী কোনোমতেই রাজি হয় না। ভিখু ক্ষুণ্ন মনে ফিরিয়া আসে।

এদিকে আকাশে চাঁদ ওঠে, নদীতে জোয়ার-ভাটা বয়, শীতের আমেজে বায়ুস্তরে মাদকতা দেখা দেয়। ভিখুর চালার পাশে কলাবাগানে চাঁপাকলার কাঁদি শেষ হইয়া আসে। বিন্নু মাঝি কলা বিক্রির পয়সায় বৌকে রুপার গোট কিনিয়া দেয়। তালের রসের মধ্যে নেশা ক্রমেই ঘোরালো ও জমাট হইয়া ওঠে। ভিখুর প্রেমের উত্তাপে ঘৃণা উবিয়া যায়। নিজেকে সে আর সামলাইয়া রাখিতে পারে না।

একদিন সকালে উঠিয়াই সে ভিখারিনীর কাছে যায়। বলে, 'আইচ্ছা, ল, ঘা লইয়াই চল্।'

ভিখারিনী বলে, 'আগে আইবার পার নাই? যা, অখন মর গিয়া আখার তলের ছালি খা গিয়া।'

'ক্যান? ছালি খাওনের কথাডা কী?'

'তোর লাইগা হাঁ কইরা বইসা আছি ভাবছস তুই, বটে? আমি উই উয়ার সাথে রইছি।'

ওদিকে তাকাইয়া ভিখু দেখিতে পায় তাহারই মতো জোয়ান দাড়িওলা এক খঞ্জ ভিখারি খানিক তফাতে আসন করিয়াছে। তাহার ডান হাতটির মতো একটি পা হাঁটুর নিচে শুকাইয়া গিয়াছে, বিশেষ যত্নসহকারে ওই অংশটুকু সামনে মেলিয়া সে আল্লার নামে দয়া প্রার্থনা করিতেছে।

পাশে পড়িয়া আছে কাঠের একটা কৃত্রিম হ্রস্ব পা।

ভিখারিনী আবার বলিল– 'বসস যে? যা পালাইয়া যা, দেখলি খুন কইরা ফেলাইবো কইয়া দিলাম।'

ভিখু বলে, 'আরে থো, খুন অমন সব হালাই করতিছে। উয়ার মতো দশটা মাইনষের একা ঘায়েল কইরা দিবার পাত্তাম, তা জানস?'

ভিখারিনী বলে, 'পারস তো যা না, উয়ার সাথে লাগ না গিয়া। আমার কাছে কী?'

'উয়াকে তুই ছাড়ান দে। আমার কাছে চ'।'

'ইরে সোনা! তামুক খাবা? ঘা দেইখা পিছাইছিলি, তোর লগে আর খাতির কিরে হালার পুত? উয়ারে ছাড়ুম ক্যান? উয়ার মতো কামাস তুই? ঘর আছে তোর? ভাগবি তো ভাগ, নইলে গাল দিমু কইলাম।'

ভিখু তখনকার মতো প্রস্থান করে। কিন্তু হাল ছাড়ে না। ভিখারিনীকে একা দেখিলেই কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। ভাব জমাইবার চেষ্টা করিয়া বলে, 'তোর নামটো কীর‍্যা?'

এমনি তাহারা পরিচয়হীন যে এতকাল পরস্পরের নাম জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজনও তাহারা বোধ করে নাই।

ভিখারিনী কালো দাঁতের ফাঁকে হাসে।

‘ফের লাগতে আইছস? হোই ও বুড়ির কাছে যা।’ ভিখু তাহার কাছে উবু হইয়া বসে। পয়সার বদলে অনেকে চাল ভিক্ষা দেয় বলিয়া আজকাল সে কাঁধে একটা ঝুলি ঝুলাইয়া বেড়ায়। ঝুলির ভিতর হইতে মর্তমান কলা বাহির করিয়া ভিখারিনীর সামনে রাখিয়া বলে ‘খা। তোর লগে চুরি কইরা আনছি।’

ভিখারিনী তৎক্ষণাৎ খোসা ছাড়াইয়া প্রেমিকের দান আত্মসাৎ করে। খুশি হইয়া বলে, ‘নাম শুনবার চাস? পাঁচী কয় মোরে, –পাঁচী। তুই কলা দিছস, নাম কইলাম, এবারে ভাগ।’

ভিখু উঠিবার নাম করে না। অতবড় একটা কলা দিয়া শুধু নাম শুনিয়া খুশি হওয়ার মতো শৌখিন সে নয়। যতক্ষণ পারে ধুলার উপর উবু হইয়া বসিয়া পাঁচীর সঙ্গে সে আলাপ করে। ওদের স্তরে নামিয়া না গেলে সে আলাপকে কেহ আলাপ বলিয়া চিনিতে পারিবে না। মনে হইবে পরস্পরকে তাহারা যেন গাল দিতেছে। পাঁচীর সঙ্গীটির নাম বসির। তার সঙ্গেও সে একদিন আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিল।

‘সেলাম মিয়া।’

বসির বলিল– ‘ইদিকে ঘুরাফিরা কী জন্য? সেলাম মিয়া হতিছে! লাঠির একঘায়ে শিরটি ছেঁচ্যা দিমু নে!’

দুজনে খুব খানিকটা গালাগালি হইয়া গেল। ভিখুর হাতে লাঠি ও বসিরের হাতে মস্ত একটা পাথর থাকায় মারামারিটা আর হইল না।

নিজের তেঁতুলগাছের তলায় ফিরিয়া যাওয়ার আগে ভিখু বলিল, ‘র, তোরে নিপাত করতেছি।’

বসির বলিল, ‘ফের উয়ার সাথে বাতচিত করলি জানে মাইরা দিমু। আল্লার কিরে।’

এই সময় ভিখুর উপার্জন কমিয়া আসিল।

পথ দিয়া প্রত্যহ নূতন নূতন লোক যাতায়াত করে না। একেবারে প্রথমবারের জন্য যাহারা পথটি ব্যবহার করে, দৈনন্দিন পথিকদের মধ্যে তাহাদের সংখ্যা দুই মাসের ভিতরই মুষ্টিমেয় হইয়া আসে। ভিখুকে একবার তাহারা একটি পয়সা দিয়াছে, পুনরায় তাহাকে দান করিবার প্রয়োজন তাহাদের অনেকেই বোধ করে না। সংসারে ভিখারির অভাব নাই।

কোনো রকমে ভিখুর পেট চলিতে লাগিল। হাটবার ছাড়া রোজগারের একটি পয়সাও সে বাঁচাইতে পারিল না। সে ভাবনায় পড়িয়া গেল।

শীত পড়িলে খোলা চালার নিচে থাকা কষ্টকর হইবে। যেখানে হোক চারদিক-ঘেরা যেমন-তেমন ঘর একখানা তাহার চাই। মাথা গুঁজিবার একটা ঠাঁই আর দুবেলা খাইতে না পাইলে কোনো যুবতী ভিখারিনীই তাহার সঙ্গে বাস করিতে রাজি হইবে না। অথচ উপার্জন তাহার যেভাবে কমিয়া আসিতেছে এভাবে কমিতে থাকিলে শীতকালে নিজেই হয়তো পেট ভরিয়া খাইতে পাইবে না।

যেভাবেই হোক আয় তাহাকে বাড়াইতেই হইবে।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অবর্ণনীয়– যা বর্ণনা করা যায় না। **অবরুদ্ধ–** বন্দী, আবদ্ধ, আটক। **আধ–** আধখান, অর্ধাংশ, আধপয়সা। **আফসোস–** খেদ, পরিতাপ, অনুশোচনা। **কোয়ানে–** কোথায় শব্দের আঞ্চলিক রূপ। **গুমোট–** বাতাস থমথমে থাকার ফলে যে গরম, বায়ু চলাচলের অভাবজনিত ভ্যাপসা। **গা গেট–** নারীর কোমরের অলঙ্কার বিশেষ, মেখলা, কটিভূষণ। **ছাতি–**বুকের পাটা বা বিস্তার, সিনা, বক্ষদেশ। **জীর্ণ–** ছেঁড়া, ছিন্ন অর্থে। **জোলো বাতাস–** জলমিশ্রিত বাতাস, ভিজা বা পানির আভাসযুক্ত বাতাস। **দুর্বিনীত–**উদ্ধত, অশিষ্ট, অবিনয়ী। **ফিনকি–** বেগে নির্গত ধারা। **ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ–** ভিক্ষায় কখনো কিছু হয় না, ভিক্ষা করে কখনো ধনী হওয়া যায় না। **বাতচিত–** কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা। **বুলি–** কথা, বাক্য, বোল। **মর্তমান–** এক জাতীয় কলা। মায়ানমারে মার্তাবান দ্বীপ থেকে এই কলার প্রজাতি আনা হয়েছে বলে কলার নাম মর্তমান কলা। **শ্লোক–** কবিতা, সংস্কৃত ভাষায় দুই পংক্তির পদ্যে রচিত বিশেষ ভাব বা দর্শন।

টীকা :

ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ’– এর মূল সংস্কৃত শ্লোকটি নিম্নরূপ–

'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তর্দর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।'

অর্থ– বাণিজ্যে লক্ষ্মী বাস করে অর্থাৎ ব্যবসার মাধ্যমে অনেক অর্থ আসে, কৃষিকাজের দ্বারা তার অর্ধেক পাওয়া যায়, রাজসেবা অর্থাৎ সরকারি চাকরির মাধ্যমে তার অর্ধেক লাভ হয়, কিন্তু ভিক্ষায় কখনো কিছু হয় না, ভিক্ষা করে কখনো ধনী হওয়া যায় না।

সারসংক্ষেপ :

ডাকাত ভিখু এবার হল ভিখারি– জটবাঁধা চাপ চাপ রুক্ষ ধূসর চুল, কোমরে জড়ানো মাটির মতো ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়া আর দড়ির মতো শীর্ণ দোদুল্যমান হাত নিয়ে দক্ষ ভিখারি। শুধু হাতখানাই হলো তার ভিক্ষাবৃত্তির জোরালো বিজ্ঞাপন। ভিক্ষা করে এক সময় কিছু পয়সা জমায় ভিখু– বিন্নু মাঝির ভাঙা চালাটি মাসিক আট আনায় ভাড়া করে বসবাসের জন্য, এই সময় তার চেতনায় দেখা দেয় যৌন-বাসনা। নারী ছাড়া নিরুৎসব জীবন তার ভালো লাগে না। অতীতের বাধাহীন জীবনের কথা তার মনে পড়ে, যে জীবনে নারীসঙ্গের কোনো অভাব ছিল না। এ সময় একদিন ভিখুর সঙ্গে পরিচয় হয় ভিখারি পাঁচীর। পাঁচীকে নিজের ঘরে নিতে চায় ভিখু। কিন্তু সমস্যা বাঁধে পাঁচীর এক পায়ের দগদগে তৈলাক্ত ঘা নিয়ে। ভিখু তাকে ঔষধ দিয়ে তা ভালো করতে বলে, কিন্তু রাজী হয় না পাঁচী। কেননা, ভিখুর শুকনো হাতের মতোই ওই দগদগে ঘা-টাই পাঁচীর ভিক্ষাবৃত্তির বড় বিজ্ঞাপন। এরপর পাঁচী বসিরের সঙ্গে থাকতে শুরু করে। পাঁচীকে পাবার জন্য উন্মত্ত হয়ে ওঠে ভিখু। পাঁচীর সঙ্গে ভাব জমানোর চেষ্টা করে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ক্ষেপে যায় বসির। ভিখুকে বসির কটু কথা বলে। বসিরের কথায় ক্ষেপে যায় ভিখু। এক দিকে পাঁচীকে পাবার দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে আয় কমে যায়– এই দুই কারণে ভিখু চিন্তিত হয়ে পড়ে। পাঁচীকে পেতে হলে আয় তাকে বাড়াতেই হবে– এটাই তখন হয়ে ওঠে ভিখুর একমাত্র ভাবনা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

৫. ভিখু কার বোনকে অপহরণ করেছিল?

ক. শ্রীপতি বিশ্বাসের   খ. পেহ্লাদের
গ. রাখু বাগ্দীর   ঘ. বৈকুণ্ঠ সাহার

৬. পাঁচী পায়ের ঘা সারায় না যে কারণে–

ক. ভিক্ষার রোজগার কমে যাবে   খ. বসির নিষেধ করেছে
গ. অর্থের অভাবে   ঘ. হাঁটুর ক্ষতি হবে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

রামশীল গ্রামের যুবক অজয় বাড়ৈ। বাবার একসময় বিত্ত ছিল। নদী ভাঙনে সব হারিয়ে আজ সে পথে বসেছে। পথচারিদের সামনে পঙ্গু সেজে তাকে খাবারের টাকা জোগাড় করতে হয়।

৭. উদ্দীপকের অজয় চরিত্রের সঙ্গে 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পে কার মিল রয়েছে?

ক. বৈকুণ্ঠ   খ. রাখু
গ. ভিখু   ঘ. বসির

৮. উদ্দীপক এবং 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পে প্রকাশিত হয়েছে–

i. জীবন সংগ্রাম
ii. প্রতিবাদী চেতনা
iii. সামাজিক অবিচার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i   খ. ii
গ. iii   ঘ. ii ও iii

পাঠ-৩

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- গল্পের 'প্রাগৈতিহাসিক' নামকরণের সার্থকতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ভিখু চরিত্র বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- পাঁচী-চরিত্র ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- 'প্রাগৈতিহাসিক' ছোটগল্পের শিল্পমূল্য বিচার করতে পারবেন।

মূলপাঠ

এখানে থাকিয়া আয় বাড়াইবার কোনো উপায়ই সে দেখিতে পায় না। চুরি-ডাকাতির উপায় নাই, মজুর খাটিবার উপায় নাই, একেবারে খুন করিয়া না ফেলিলে কাহারো কাছে অর্থ ছিনাইয়া লওয়া একহাতে সম্ভব নয়। পাঁচীকে ফেলিয়া এই শহর ছাড়িয়া কোথাও যাইতে তাহার ইচ্ছা হয় না। আপনার ভাগের বিরুদ্ধে ভিখুর মন বিদ্রোহী হইয়া ওঠে। তাহার চালার পাশে বিন্নু মাঝির সুখী পারিবারিক জীবনটা তাহাকে হিংসায় জর্জরিত করিয়া দেয়। এক-একদিন বিন্নুর ঘরে আগুন ধরাইয়া দিবার জন্য মন ছটফট করিয়া ওঠে। নদীর ধারে খ্যাপার মতো ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার মনে হয় পৃথিবীর যত খাদ্য ও যত নারী আছে একা সব দখল করিতে না পারিলে তাহার তৃপ্তি হইবে না।

আর কিছুকাল ভিখু এমনি অসন্তোষের মধ্যে কাটাইয়া দিল। তারপর একদিন গভীর রাত্রে ঝুলির মধ্যে তাহার সমস্ত মূল্যবান জিনিস ভরিয়া, জমানো টাকা কটি কোমরের কাপড়ে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ভিখু তাহার চালা হইতে বাহির হইয়া পড়িল। নদীর ধারে একদিন সে হাতখানেক লম্বা একটা লোহার শিক কুড়াইয়া পাইয়াছিল। অবসরমতো পাথরে ঘষিয়া শিকটির একটা মুখ সে চোখা করিয়াছে। এই অস্ত্রটি সে ঝুলির মধ্যে ভরিয়া সঙ্গে লইল।

অমাবস্যার অন্ধকারে আকাশভরা তারা তখন ঝিকিমিকি করিতেছে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা। বহুকাল পরে মধ্যরাত্রির জনহীন জগতে মনের মধ্যে ভয়ানক একটা কল্পনা লইয়া বিচরণ করিতে বাহির হইয়া ভিখুর অকথনীয় উল্লাস বোধ হইল। নিজের মনে অস্ফুটস্বরে সে বলিয়া উঠিল, 'বাঁটি লইয়া ডানটির যদি রেহাই দিতা ভগমান!'

নদীর ধারে ধারে আধমাইল হাঁটিয়া গিয়া একটি সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া সে শহরে প্রবেশ করিল। বাজার বাঁ-হাতি রাখিয়া ঘুমন্ত শহরের বুকে ছোট ছোট অলিগলি দিয়া শহরের অপর প্রান্তে গিয়া পৌঁছিল। শহরে যাওয়ার পাকা রাস্তাটি এখান দিয়া শহর হইতে বাহির হইয়াছে। নদী ঘুরিয়া আসিয়া দু মাইল তফাত এই রাস্তারই পাশে মাইলখানেক রহিয়া গিয়া আবার দক্ষিণে দিক পরিবর্তন করিয়াছে।

কিছু দূর পর্যন্ত রাস্তার দুদিকে ফাঁকে ফাঁকে দু-একটি বাড়ি চোখে পড়ে। তারপর ধানের ক্ষেত ও মাঝে মাঝে জঙ্গলাকীর্ণ পতিত ডাঙার দেখা পাওয়া যায়। এমনি একটা জঙ্গলের ধারে জমি সাফ করিয়া পাঁচ-সাতখানা কুঁড়ে তুলিয়া কয়েকটা হতভাগা মানুষ একটি দরিদ্রতম পল্লি স্থাপিত করিয়াছে। তার মধ্যে একটি কুঁড়ে বসিরের। ভোরে উঠিয়া ঠকঠক শব্দে কাঠির পা ফেলিয়া সে শহরে ভিক্ষা করিতে যায়, সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসে। পাঁচী গাছের পাতা জ্বালাইয়া ভাত রাঁধে, বসির টানে তামাক। রাত্রে পাঁচী পায়ের ঘায়ে ন্যাকড়ার পটি জড়ায়। বাঁশের খাটে পাশাপাশি শুইয়া তাহাদের কাটা কাটা কদর্য ভাষায় গল্প করিতে করিতে তাহারা ঘুমাইয়া পড়ে। তাহাদের নীড়, তাহাদের শয্যা ও তাহাদের দেহ হইতে একটা ভাপসা পচা দুর্গন্ধ উঠিয়া খড়ের চালের ফুটা দিয়া বাহিরের বাতাসে মিশিতে থাকে।

ঘুমের ঘোরে বসির নাক ডাকায়। পাঁচী বিড়বিড় করিয়া বকে।

ভিখু একদিন ওদের পিছু পিছু আসিয়া ঘর দেখিয়া গিয়াছিল। অন্ধকারে সাবধানে ঘরের পিছনে গিয়া বেড়ার ফাঁকে কান পাতিয়া সে কিছুক্ষণ কচুবনের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর ঘুরিয়া ঘরের সামনে আসিল। ভিখারির কুঁড়ে, দরজার ঝাঁপটি পাঁচী ভিতর হইতে বন্ধ করে নাই, শুধু ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল। ঝাঁপটা সন্তর্পণে একপাশে সরাইয়া ঝুলির ভিতর হইতে

শিকটি বাহির করিয়া শক্ত করিয়া ধরিল। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। বাহিরে তারার আলো ছিল, ঘরের ভিতরে সেটুকু আলোরও অভাব। দেশলাই জ্বালিবার অতিরিক্ত হাত নাই; ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া ভিখু ভাবিয়া দেখিল বসিরের হৃৎপিণ্ডের অবস্থানটি নির্ণয় করা সম্ভব নয়। বাঁ হাতের আঘাত, ঠিক জায়গামতো না পড়িলে বসির গোলমাল করিবার সুযোগ পাইবে। তাহাতে মুশকিল অনেক।

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া বসিরের শিয়রের কাছে সরিয়া গিয়া একটিমাত্র আঘাতে ঘুমন্ত লোকটার তালুর মধ্যে শিকের চোখা দিকটা সে প্রায় তিন আঙুল ভিতরে ঢুকাইয়া দিল। অন্ধকারে আঘাত কতদূর মারাত্মক হইয়াছে বুঝিবার উপায় ছিল না। শিকটা মাথার মধ্যে ঢুকিয়াছে টের পাইয়াও ভিখু তাই নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। একহাতে সবলে বসিরের গলা চাপিয়া ধরিল।

পাঁচীকে বলিল, 'চুপ থাক; চিল্লোবি তো তোরেও মাইরা ফেলামু।'

পাঁচী চেঁচাইল না, ভয়ে গোঙাইতে লাগিল।

ভিখু তখন আবার বলিল, 'একটুকু আওয়াজ লয়, ভালো চাস তো একদম চুপ মাইরা থাক।'

বসির নিস্পন্দ হইয়া গেলে ভিখু তাহার গলা হইতে হাত সরাইয়া লইল।

দম লইয়া বলিল, 'আলোটা জ্বাইলা দে পাঁচী।'

পাঁচী আলো জ্বালিলে ভিখু পরম তৃপ্তির সঙ্গে নিজের কীর্তি চাহিয়া দেখিল। একটিমাত্র হাতের সাহায্যে অমন জোয়ান মানুষটাকে ঘায়েল করিয়া গবূের তাহার সীমা ছিল না। পাঁচীর দিকে তাকাইয়া সে বলিল, 'দেখছস? কেডা কারে খুন করল দেখছস? তখন পই-পই কইরা কইলাম; মিয়াবাই ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাইবার লারবা গো, ছাড়ান দেও। শুইনে মিয়াবায়ের অইল গোসা! কয় কিনা, শির ছেঁচ্যা দিমু! দেন গো দেন, শির ছেঁচ্যাই দেন মিয়াবাই।' বসিরের মৃতদেহের সামনে ব্যঙ্গভরে মাথাটা একবার নত করিয়া ভিখু মাথা দুলাইয়া হা-হা করিয়া হাসিতে লাগিল। সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, 'ঠ্যারাইন বোবা ক্যান গো? আরে কথা ক হাড়হাবাইতা মাইয়া! তোরে দিমু নাকি সাবার কইরা, –অ্যাঁ?'

পাঁচী কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, 'ইবারে কী করবি?'

'দ্যাখ কী করি। পয়সাকরি কনে গুইনা রাখছে, আগে তাই ক।'

বসিরের গোপন সঞ্চয়ের স্থানটি পাঁচী অনেক কষ্টে আবিষ্কার করিয়াছিল। ভিখুর কাছে প্রথমে সে অজ্ঞতার ভান করিল। কিন্তু ভিখু আসিয়া চুলের মুঠি চাপিয়া ধরিলে প্রকাশ করিতে পথ পাইল না।

বসিরের সমস্ত জীবনের সঞ্চয় কম নয়, টাকায় আধুলিতে একশত টাকার ওপর। একটা মানুষকে হত্যা করিয়া ভিখু পূর্বে ইহার চেয়ে বেশি উপার্জন করিয়াছে। তবু সে খুশি হইল। বলিল, 'কী কী নিবি পুঁটলি বাঁইধা ফ্যালা পাঁচী। তারপর ল' রাইত থাকতে মেলা করি। খানিক বাদে নওমির চান্দ উঠব, আলোয় পথটুকু পার হমু।'

পাঁচী পুঁটুলি বাঁধিয়া লইল। তারপর ভিখুর হাত ধরিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ঘরের বাহির হইয়া রাস্তায় গিয়া উঠিল। পূর্বাকাশের দিকে চাহিয়া ভিখু বলিল, 'অখনই চান্দ উঠব পাঁচী।'

পাঁচী বলিল, 'আমরা যামু কনে?'

'সদর। ঘাটে না' চুরি করুম। বিয়ানে ছিপতিপুরের সামনে জংলার মদ্যি ঢুইকা থাকুম, রাইতে একদম সদর। পা চালাইয়া চ' পাঁচী, এক কোশ পথ হাঁটন লাগব।'

পায়ের ঘা লইয়া তাড়াতাড়ি চলিতে পাঁচীর কষ্ট হইতেছিল। ভিখু সহসা একসময় দাঁড়াইয়া পড়িল। বলিল,

'পায়ে নি তুই ব্যথা পাস পাঁচী?'

'হ, ব্যথা জানায়।'

'পিঠে চাপামু?'

'পারবি ক্যান?'

'পারুম, আয়।'

ভিখুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া পাঁচী তাহার পিঠের ওপর ঝুলিয়া রহিল। তাহার দেহের ভারে সামনে ঝুঁকিয়া ভিখু জোরে জোরে পথ চলিতে লাগিল। পথে দুদিকে ধানের ক্ষেত আবছা আলোয় নিঃসাড়ে পড়িয়া আছে। দূরে গ্রামের গাছপালার পিছন হইতে নবমীর চাঁদ আকাশে উঠিয়া আসিয়াছে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা।

হয়তো ওই চাঁদ আর এই পৃথিবীর ইতিহাস আছে। কিন্তু যে ধারাবাহিক অন্ধকার মাতৃগর্ভ হইতে সংগ্রহ করিয়া দেহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া ভিখু ও পাঁচী পৃথিবীতে আসিয়াছিল এবং যে অন্ধকার তাহারা সন্তানের মাংসল আবেষ্টনীর মধ্যে গোপন রাখিয়া যাইবে তাহা প্রাগৈতিহাসিক, পৃথিবীর আলো আজ পর্যন্ত তাহার নাগাল পায় নাই, কোনোদিন পাইবেও না।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অকথনীয়– যে কথা বলা যায় না। **কদর্য–** অতি কুৎসিত, কদাকার, অত্যন্ত বিশ্রী। **কোশ–** ক্রোশ। **চোখা–** তীক্ষ্ণ, ধারাল, **অতি গোসা–** রাগ, ক্রুদ্ধ। **জঙ্গলাকীর্ণ–** জঙ্গলে পূর্ণ । **না'–**নাও, নৌকা। **নিস্পন্দ–** স্পন্দনশূন্য, স্থির, অচঞ্চল, অকম্পিত। **নিঃসাড়ে–** সাড়াশূন্য, শব্দহীনভাবে। **ন্যাকড়া–** ছেঁড়া কাপড়, জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড। **প্রাগৈতিহাসিক–** যে যুগ থেকে ইতিহাস জানা যায় তার পূর্বকালের। **বিয়ানে–** সকালে। **ভ্যাপসা–** বায়ু চলাচলহীন স্থানে দুর্গন্ধ অবরুদ্ধ বাষ্প বা তাপের মতো, গুমোট। **লারবা–** পারবে না। **সন্তর্পণে–** সাবধানে, শব্দহীনভাবে অতি আস্তে বা ধীরে।

সারসংক্ষেপ :

একদিকে পাঁচীকে পাবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে বসিরের আক্রোশ ভিখুকে উন্মত্ত করে তোলে। অবশেষে অন্ধকার রাতে বসিরকে লোহার শিক দিয়ে হত্যা করে পাঁচীকে নিয়ে দূরদেশে যাত্রা করে ভিখু। আকাশে তখন নবমীর চাঁদ। ভিখু পাঁচীকে নিয়ে এগিয়ে চলল। ভিখু-পাঁচীর মধ্যে লেখক মানব-অভিযাত্রার কথা বলে শেষ করেন প্রাগৈতিহাসিক গল্প।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৯. ভিখু কার পারিবারিক জীবনে হিংসায় জর্জরিত হয়?

ক. বিন্নু মাঝি　　খ. বৈকুণ্ঠ সাহা
গ. শ্রীপতি বিশ্বাস　　ঘ. ভরত বাগদী

১০. 'প্রাগৈতিহাসিক' বলতে বোঝায় –

i. ইতিহাসের পূর্ব কাহিনি
ii. ইতিহাসের সমকালীন কাহিনি
iii. ইতিহাসের পরবর্তী কাহিনি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. i ও ii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

পাকিস্তানি সৈনিকেরা রুহুল কুদ্দুসের বাড়িতে হানা দিয়েছে। ঘরে কেবল মা আর মেয়ে। মায়ের বয়স চল্লিশ, কিন্তু ভারি মজবুত দেহের গড়ন। এখনো স্বচ্ছন্দে তিরিশ বলে চালিয়ে দেওয়া যায়, মেয়ে দুটির একটি উনিশ, একটি সতেরো। জওয়ানরা ভারি খুশি।

১১. উদ্দীপকের জওয়ানরা 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পে কার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক. পেহ্লাদ　　খ. ভিখু
গ. বৈকুণ্ঠ　　ঘ. বশির

১২. উদ্দীপক ও 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পে প্রকাশ পেয়েছে–

ক. আদিম কামনা　　খ. পৃথিবীর আলো
গ. বসিরের জিঘাংসা　　ঘ. পেহ্লাদের মানবিকতা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১৩. ভিখু রাখুর বউকে নিয়ে কোথায় পালিয়েছিল?

ক. বসন্তপুরে — খ. হাতিয়ায়
গ. পাহানায় — ঘ. চিতলপুরে

১৪. বৈকুণ্ঠ সাহার বাড়িতে আক্রমণ করা হয় যে কারণে−

ক. অর্থের প্রয়োজনে — খ. আদিম কামনায়
গ. প্রতিশোধ স্পৃহায় — ঘ. পৈশাচিক উল্লাসে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১৫ ও ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

বিনোদ ভাগ্যান্বেষী মানুষ। ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য সে গোবিন্দপুর গ্রামে এসে আস্তানা গাড়ে। সেখানে একটি জঙ্গলাকীর্ণ স্থানকে তীর্থস্থান বানিয়ে শুরু হয় বিনোদের 'ভাড়াটে সন্ত্রাসী' খাটার কাজ।

১৫. উদ্দীপকের বিনোদ চরিত্রের সঙ্গে 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পে কার সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. শ্রীপতি বিশ্বাস — খ. পেহ্লাদ
গ. ভিখু — ঘ. বসির

১৬. বিনোদের সঙ্গে চরিত্রটির এরূপ সাদৃশ্যের কারণ−

ক. রিরংসা — খ. প্রবৃত্তি
গ. হতাশা — ঘ. উত্তেজনা

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ :

মানুষের বেঁচে থাকার আকুতি চিরকালীন। যার অনেক আছে সেও চায়, যার সামান্য আছে সেও পৃথিবীতে তার অস্তিত্বের ছাপ রেখে যেতে চায়। জগৎ-সংসারে এ বিষয়ে ধনী-নির্ধন, বলশালী-দুর্বল সকলেই সমান। সভ্যতার ক্রম অগ্রসরমান গতি মানুষের বেঁচে থাকার ইচ্ছাকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে। কিন্তু যার কিছুই নেই, তার বেঁচে থাকার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। পৃথিবীতে বেঁচে থাকাই মানব জীবনের পরম আকাঙ্ক্ষা।

ক. পেহ্লাদের ঘরে কে আগুন দিয়েছিল?
খ. পাঁচীর প্রতি ভিখুর আকর্ষণের কারণ বর্ণনা করুন।
গ. উদ্দীপকের 'বেঁচে থাকার আকুতি' 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পে কোন চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে?
ঘ. "উদ্দীপকের মূল ভাবনা 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পে ফুটে উঠেছে।" −মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন-১

ক.

পেহ্লাদের ঘরে ভিখু আগুন দিয়েছিল।

খ.

পাঁচীর প্রতি ভিখুর আকর্ষণের মূলে রয়েছে জৈবিক চাহিদা ও অর্থনৈতিক সুবিধাপ্রাপ্তি।

ভিখু ভিক্ষা করতে গিয়ে পর্যাপ্ত খাবার-দাবার পেয়ে একসময় হৃষ্ট-পুষ্ট হয়ে উঠে। এ সময়ে ভিখারি পাঁচীর প্রতি তার লোলুপ দৃষ্টি পড়ে। বস্তুত দুটি কারণে পাঁচীর প্রতি ভিখুর আকর্ষণ তৈরি হয়− প্রথমত পাঁচীর সঙ্গে বসবাস, দ্বিতীয়ত পাঁচীর রোজগারের জমানো টাকা। ভিখু মনে করেছে পাঁচীকে পেলে একদিকে তার দৈহিক কামনা মিটবে আর অন্যদিকে তার রোজগারের টাকায় সুখে থাকতে পারবে।

গ.

উদ্দীপকের 'বেঁচে থাকার আকুতি' 'প্রাগৈতিহাসিক' ছোটগল্পে ভিখু চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে।

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অনুকূল পরিবেশ প্রয়োজন। মানবসমাজে মানুষ তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সব কিছু করতে পারে। সে যখন অস্তিত্ব সংকটে পড়ে তখন জীবনের ক্ষুদ্র অবলম্বনকেও আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়। বেঁচে থাকার জন্য মানুষ অস্তিত্বের শেষ বিন্দু পর্যন্ত লড়াই করে।

উদ্দীপকে মানুষের বেঁচে থাকার চরম আকুলতার কথা বলা হয়েছে। মানুষ যখন অস্তিত্ব সংকটে পড়ে তখন তার বেঁচে থাকার ইচ্ছা প্রবল হয়। তার জীবনের একমাত্র ধ্যান ও জ্ঞান হচ্ছে আপন অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখা। 'প্রাগৈতিহাসিক' ছোটগল্পেও দেখা যায়, ভিখু তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রবল সংগ্রাম করেছে। বেঁচে থাকার দাবিতে সে জঙ্গলের পোকা-মাকড় ও সাপ-বিচ্ছুর সঙ্গে লড়াই করেছে। অর্থের প্রয়োজনে বসন্তপুরে ডাকাতি করতে গিয়ে বৈকুণ্ঠ সাহাকে খুন করেছে। আদিম কামনায় প্রবৃত্ত হয়ে পাঁচীকে পাবার প্রত্যাশায় বসিরকে খুন করেছে। এভাবে সে আদিম বর্বর মনোবৃত্তিতে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে সচেষ্ট হয়েছে। তাই বেঁচে থাকার আকুলতা 'প্রাগৈতিহাসিক' ছোটগল্পে ভিখু চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ.

উদ্দীপকের মূল ভাবনা 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পে ফুটে উঠেছে- মন্তব্যটি যথার্থ হয়েছে।

প্রাণী মাত্রই নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার প্রয়াসে আজীবন সংগ্রামী। মানুষও যেহেতু প্রাণ ধারণ করে তাই সে প্রাণ রক্ষার দায়ও তার পতিত হয়। এই দায়ভার বহন করার প্রয়োজনে মানুষ প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে এসে বর্তমান সময়ে উপনীত হয়েছে, সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করেছে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, বেঁচে থাকার প্রবণতা মানুষের সহজাত। যার বেঁচে থাকার পথ যত কষ্টকর, তার বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষাও তত তীব্র। কেননা মানুষকে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে প্রাণ ধারণ করার উপকরণ খুব কষ্ট করে সংগ্রহ করতে হয়। 'প্রাগৈতিহাসিক' ছোটগল্পেও দেখা যায়, নিজের জীবনকে অস্তিত্বশীল করতে ভিখু নিজ চরিত্রে আদিম যুগের বন্যতাকে ধারণ করেছে। পেহ্লাদের বাড়িতে অবস্থানকালে সে কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করেছে। আবার মহকুমা শহরে স্বাভাবিক দিন ফিরে পেতেই তার লোলুপ দৃষ্টি পড়ে পাঁচীর উপর। একসময় রাতের অন্ধকারে পাঁচীকে পিঠে নিয়ে ভিখু সদরের উদ্দেশে পালিয়ে যায়। এভাবে দেখা যায়, জৈবিক প্রবৃত্তির আদিমতা ও মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম 'প্রাগৈতিহাসিক' ছোটগল্পে উঠে এসেছে।

'প্রাগৈতিহাসিক' ছোটগল্পে ভিখুর জীবন আদিম কামনা-বাসনা ও বুনো বর্বরতায় পর্যবসিত। উদ্দীপকেও মানুষের বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে। বস্তুত উদ্দীপকে বর্ণিত বেঁচে থাকার এ আদিম আকাঙ্ক্ষাটিই প্রাগৈতিহাসিক গল্পের মূল উপজীব্য। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের মূল ভাবনা 'প্রাগৈতিহাসিক' ছোটগল্পে শিল্পসফলভাবে ফুটে উঠেছে।

অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

'লালসালু' উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও ধর্মভীরু মহব্বতনগর গ্রামের মানুষের জীবনচিত্র। এই সমাজে মজিদ টিকে থাকার সংগ্রামে লিপ্ত। জীবনযুদ্ধে সংগ্রামী মজিদ নিজের জন্মস্থান থেকে বহুদূরের মহব্বতনগরে একটি পুরাতন জীর্ণ কবরকে মোদাচ্ছের পিরের মাজার হিসাবে ঘোষণা করে। ওই এলাকার মানুষদের বেএলেম বলে অভিহিত করে। কিন্তু ধর্মীয় উদ্দেশ্যে মজিদ মাজার প্রতিষ্ঠা করেনি। তার উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম ব্যবসায়। এভাবে মাজার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মজিদ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতির সুযোগ নিয়ে সম্পদশালী হয়ে ওঠে।

ক. বসিরকে কী দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল?

খ. ভিখুর ভিক্ষুক জীবনের পরিচয় দিন।

গ. উদ্দীপকের মজিদের সঙ্গে 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পে কার সাদৃশ্য রয়েছে? –আলোচনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপকের অস্তিত্ববাদী চেতনা 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পে প্রবলভাবে ফুটে উঠেছে।" –মন্তব্যটি বিচার করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খ ২. ক ৩. ক ৪. ক ৫. ক ৬. খ ৭. গ ৮. ক ৯. ক ১০. ক ১১. খ ১২. ক
১৩. খ ১৪. ক ১৫. গ ১৬. খ

একটি তুলসী গাছের কাহিনি

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

ভূমিকা

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র *দুই তীর ও অন্যান্য গল্প* (১৯৬৫) সংকলন থেকে 'একটি তুলসী গাছের কাহিনি' গল্পটি চয়ন করা হয়েছে। সীমিত পরিসরে গভীরতর কোনো জীবনসত্য প্রকাশে ওয়ালীউল্লাহ্র ছোটগল্প বিশিষ্টতার পরিচয়বাহী। দেশ-বিভাগের ঝাপটায় মানুষের জীবন কীভাবে বিপন্ন হয়ে উঠেছিল, মানুষের মাঝে কীভাবে প্রবল হয়ে উঠেছিল সম্প্রদায়চেতনা– বক্ষ্যমাণ গল্পে তা চমৎকার ব্যঞ্জনায় ফুটে উঠেছে। সে বিবেচনায় বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি বিশেষ অধ্যায়ের শিল্পপ্রতিমা হিসেবেই গ্রহণ করা যায় 'একটি তুলসী গাছের কাহিনি' গল্পটিকে।

সাধারণ উদ্দেশ্য

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র 'একটি তুলসী গাছের কাহিনি' গল্পটি পাঠ করে আপনি–

- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র ছোটগল্পের শিল্পবৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবেন।
- 'একটি তুলসী গাছের কাহিনি' ছোটগল্পের শিল্প-সার্থকতা বিচার করতে পারবেন।
- দেশ-বিভাগের ফলে মানুষের জীবন কীভাবে বিপন্ন হয়ে উঠেছিল তার পরিচয় দিতে পারবেন।
- একটি তুলসী গাছের বিপন্নতার রূপকে মানব-ভাগ্যের বিপন্নতার রূপকচিত্র ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পাঠ-১

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- উদ্বাস্তু মানুষেরা পরিত্যক্ত বাড়িটা কীভাবে দখল করে নিল, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- পরিত্যক্ত বাড়ির রান্নাঘরের পেছনে তুলসী-গাছ নিয়ে দখলকারীদের নানামাত্রিক মনোভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- দেশবিভাগ মানুষের জীবনে কী ভয়ংকর বিপন্নতা নিয়ে আসে, তা আলোচনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

ধনুকের মতো বাঁকা কংক্রিটের পুলটির পরেই বাড়িটা। দোতলা, উঁচু এবং প্রকাণ্ড বাড়ি। তবে রাস্তা থেকেই সরাসরি দণ্ডায়মান। এদেশে ফুটপাত নাই বলে বাড়িটারও একটু জমি ছাড়ার ভদ্রতার বালাই নাই। তবে সেটা কিন্তু বাইরের চেহারা। কারণ, পেছনে অনেক জায়গা। প্রথমত প্রশস্ত উঠান। তারপর পায়খানা-গোসলখানার পরে আম-জাম-কাঁঠাল গাছে ভরা জঙ্গলের মতো জায়গা। সেখানে কড়া সূর্যালোকে ও সূর্যাস্তের ম্লান অন্ধকার এবং আগাছায় আবৃত মাটিতে ভাপসা গন্ধ।

অত জায়গা যখন তখন সামনে কিছু ছেড়ে একটা বাগান করলে কী দোষ হতো?

সে-কথাই এরা ভাবে। বিশেষ করে মতিন। আর বাগানের বড় শখ, যদিও আজ পর্যন্ত তা কল্পনাতেই পুষ্পিত হয়েছে। সে ভাবে, একটু জমি পেলে সে নিজেই বাগানের মতো করে নিতো। যত্ন করে লাগাতো মৌসুমি ফুল, গন্ধরাজ-বকুল-হাস্নাহেনা, দু-চারটে গোলাপও। তারপর সন্ধ্যার পর আপিস ফিরে সেখানে বসতো। একটু আরাম করে বসবার জন্যে হাল্কা বেতের চেয়ার না ক্যানভাসের ডেকচেয়ারই কিনে নিতো। তারপর গা ঢেলে বসে গল্প-গুজব করতো। আমজাদের হুকার অভ্যাস। বাগানের সম্মান বজায় রেখে সে না হয় একটা মানানসই নলওয়ালা সুদৃশ্য গুড়গুড়ি কিনে নিতো। কাদের গল্প-

প্রেমিক। ফুরফুরে হাওয়ায় তার কণ্ঠ কাহিনিময় হয়ে উঠতো। কিংবা পুষ্পসৌরভে মদির জ্যোৎস্নারাতে গল্প না করলেই বা কী এসে যেতো? এমনিতে চোখ বুজে বসেই নীরবে সান্ধ্যকালীন স্নিগ্ধতা উপভোগ করতো তারা।

আপিস থেকে শ্রান্ত হয়ে ফিরে প্রায় রাস্তা থেকেই চড়তে থাকা দোতলায় যাবার সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে মতিনের মনে জাগে এসব কথা।

বাড়িটা তারা দখল করেছে। অবশ্য লড়াই না করেই আমাদের সামরিক শক্তি অনুমান করে বাড়ির মালিক যে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল, তা নয়। দেশভঙ্গের হুজুগে এ শহরে এসে তারা যেমন তেমন একটা ডেরার সন্ধানে উদয়াস্ত ঘুরছে, তখন একদিন দেখতে পায় বাড়িটা। সদর দরজায় মস্ত তালা, কিন্তু সামান্য পর্যবেক্ষণের পর বুঝতে পারে বাড়িতে জনমানব নাই এবং তার মালিক দেশপলাতক। পরিত্যক্ত বাড়ি চিনতে দেরি হল না। কিন্তু এমন বাড়ি পাওয়া নিতান্ত সৌভাগ্যের কথা। সৌভাগ্যের আকস্মিক আবির্ভাবে প্রথমে তাদের মনে ভয়ই উপস্থিত হয়। সে ভয় কাটতে দেরি হয় না। সেদিন সন্ধ্যায় তারা সদলবলে এসে দরজার তালা ভেঙে রৈ-রৈ আওয়াজ তুলে বাড়িটায় প্রবেশ করে। তাদের মধ্যে তখন বৈশাখের আম-কুড়ানো ক্ষিপ্র উন্মাদনা বলে ব্যাপারটা তাদের কাছে দিন-দুপুরে ডাকাতির মতো মনে হয় না। কোনো অপরাধের চেতনা যদি বা মনে জাগার প্রয়াস পায় তা বিজয়ের উল্লাসে নিমেষে তুলোধুনো হয়ে উড়ে যায়।

পরদিন শহরে খবরটা ছড়িয়ে পড়লে অনাশ্রিতদের আগমন শুরু হয়। মাথার ওপর একটা ছাদ পাবার আশায় তারা দলে-দলে আসে।

বিজয়ের উল্লাসটা ঢেকে এরা বলে, কী দেখছেন? জায়গা নাই কোথাও। সব ঘরেই বিছানা পড়েছে। এই যে ছোট-ঘরটি, তাতেও চার-চারটে বিছানা পড়েছে। এখন তো শুধু বিছানা মাত্র। পরে ছ-ফুট বাই আড়াই-ফুট চারটি চৌকি এবং দু-একটা চেয়ার-টেবিল এলে পা ফেলার জায়গা থাকবে না।

একজন সমবেদনার কণ্ঠে বলে,

আপনাদের তক্‌লিফ আমরা কি বুঝি না? একদিন আমরা কি কম কষ্ট পেয়েছি? তবে আপনাদের কপাল মন্দ! সেই হচ্ছে আসল কথা।

যারা হতাশ হয় তাদের মুখ কালো হয়ে ওঠে সমবেদনা ভরা উক্তিতে।

ঐ ঘরটা?

নিচের তলার রাস্তার ধারে ঘরা অবশ্য খালিই মনে হয়।

খালি দেখালেও খালি নয়। ভালো করে চেয়ে দেখুন। দেয়ালের পাশে সতরঞ্জিতে বাঁধা দুটি বেডিং। শেষ জায়গাটাও দু-ঘণ্টা হল অ্যাকাউন্টস এর মোটা বদরুদ্দিন নিয়ে নিয়েছে। শালার কাছ থেকে বিছানাপত্তর আনতে গেছে। শালাও আবার তার এক দোস্তের বাড়ির বারান্দার আস্তান গেড়েছে। পরিবার না থাকলে শালাটিও এসে হাজির হত।

নেহাত কপালের কথা। আবার একজনের কণ্ঠ সমবেদনায় খলখল করে ওঠে। যদি ঘণ্টা দুয়েক আগে আসতেন তবে বদরুদ্দিনকে কলা দেখাতে পারতেন। ঘরটায় তেমন আলো নেই বটে কিন্তু দেখুন জানালার পাশেই সরকারি আলো। রাতে কোনোদিন ইলেকট্রিসিটি ফেল করলে সে-আলোতেই দিব্যি চলে যাবে।

বা কিল্পনতা যদি করতে চায়-

অবশ্য এ-সব পরাহত বাড়ি-সন্ধানীদের কানে বিষবৎ মনে হয়।

যথাসময়ে বেআইনি বাড়ি দখলের ব্যাপারটা তদারক করাবার জন্যে পুলিশ আসে। সেটা স্বাভাবিক। দেশেময় একটা ঘোর পরিবর্তনের আলোড়ন বটে কিন্তু কোথাও যে রীতিমত মগের মুলুক পড়েছে তা নয়। পুলিশ দেখে তারা ভাবে, পলাতক গৃহকর্তা কি বাড়ি উদ্ধারের জন্যে সরকারের কাছে আবেদন করেছে? তবে সে-কথা বিশ্বাস হয় না দু-দিনের মধ্যে বাড়িটা খালি করে দিয়ে যে দেশ থেকে উধাও হয়ে গেছে বর্তমানে তার অন্যান্য গভীর সমস্যার কথা ভাববার আছে। সন্দেহ থাকে না যে, পুলিশকে খবর দিয়েছে তারাই যারা সময় মতো এখানে না এসে শহরের অন্য কোনো প্রান্তে নিষ্ফলভাবে বাড়ি দখলের ফিকিরে ছিল। মন্দভাগ্যের কথা মানা যায় কিন্তু সত্য করা যায় না। ন্যায্য অধিকারস্বত্ব এক কথা, অন্যায়ের ওপর ভাগ্য লাভ অন্য কথা। হিংসাটা ন্যায়সঙ্গত-তো মনে হয়-ই, কর্তব্য বলেও মনে হয়।

এরা রুখে দাঁড়ায়।

আমরা দরিদ্র কেরানি মানুষ বটে কিন্তু সবাই ভগ্র ঘরের ছেলে। বাড়ি দখল করেছি বটে কিন্তু জানালা-দরজা ভাঙি নাই, ইট-পাথর খসিয়ে চোরাবাজারেও চালান করে দিই নাই।

আমরাও আইন-কানুন বুঝি। কে নালিশ করেছে? বাড়িওয়ালা নয়। তবে নালিশটাও যথাযথ নয়।

কাদের কেবল কাতর রব তোলে। যাবো কোথায়? শখ করে কি এখানে এসে উঠেছি? সদলবলে সাব ইনস্পেক্টর ফিরে গিয়ে না-হক না বেহক না-ভালো না-মন্দ গোছের ঘোর-ঘোরালো রিপোর্ট দেয় যার মর্মার্থ উদ্ধারের ভয়েই হয়তো ওপরওয়ালা তা ফাইল চাপা দেয় শ্রেয় মনে করে। অথবা বুঝতে পারে, এই হুজুগের সময় অন্যায়ভাবে বাড়ি দখলের বিষয়ে সরকারি আইনটা যেন তেমন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না।

কাদের চোখ টিপে বলে, সত্য কথা বলতে দোষ কী? সাব-ইনস্পেক্টরের দ্বিতীয় বউ আমার এক রকম আত্মীয়া। বলো না কাউকে কিন্তু।

কথাটা অবশ্য কারোরই বিশ্বাস হয় না। তবে অসত্যটির গোড়ায় যে কেবল একটা নির্মল আনন্দের উসকানি, তা বুঝে কাদেরকে ক্ষমা করতে দ্বিধা হয় না।

উৎফুল্ল কণ্ঠে কেউ প্রস্তাব করে, কী হে, চা-মিষ্টিটা হয়ে যাক।

রাতারাতি সরগরম হয়ে ওঠে প্রকাণ্ড বাড়িটা। আস্তানা একটি পেয়েছে এবং সে আস্তানাটি কেউ হাত থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। –শুধু এ বিশ্বাসই তার কারণ নয়। খোলা-মেলা ঝরঝরে তকতকে এ বাড়ি তাদের মধ্যে একটা নতুন জীবন-সঞ্চার করেছে যেন। এদের অনেকেই কলকাতায় ব্লকম্যান লেন-এ খালাসি পট্টিতে, বৈঠকখানায় দফতরিদের পাড়ায় সৈয়দ সালেহ লেন–এ তামাক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বা কমরু খানসামা লেন– এ অকথ্য দুর্গন্ধ নোংরার মধ্যে দিন কাটিয়েছেন। তুলনায় এ বাড়ির বড় বড় কামরা, নীলকুঠি দালানের ফ্যাশানে মস্ত জানালা, খোলামেলা উঠান, আরো পেছনে বনজঙ্গলের মতো আম-জাম-কাঁঠালের বাগান-এসব একটি ভিন্ন দুনিয়া যেন। এরা লাটবেলাটের মতো এক খানা ঘর দখল করে নাই সত্য, তবু এত আলো বাতাস কখনো তারা উপভোগ করে নাই। তাদের জীবনে সবুজ তৃণ গজাবে ধমনীতে সবল সতেজ রক্ত আসবে, হাজার-দুহাজার ওয়ালাদের মতো মুখে ধন-স্বাস্থ্যের জৌলুস আসবে, দেহও ম্যালেরিয়া-কালাজ্বর-ক্ষয় ব্যাধিমুক্ত হবে। রোগাপট্‌কা ইউনুস ইতিমধ্যে তার স্বাস্থ্যের পরিবর্তন দেখতে পায়। সে থাকতো ম্যাকলিওড স্ট্রিটে। গলিটা যেন সকালবেলার আবর্জনা ভরা ডাস্টবিন। সে গলিতেই নড়বড়ে ধরনের একটা কাঠের দোতলা বাড়িতে রান্নাঘরের পাশে স্যাঁৎসেতে একটি কামরায় কচ্ছদেশীয় চামড়া ব্যবসায়ীদের সঙ্গে চার বছর সে বাস করেছে। পাড়াটি চামড়ার উৎকট গন্ধে সর্বক্ষণ এমন ভরপুর হয়ে থাকতো যে রাস্তার ড্রেনের পচা দুর্গন্ধ নাকে পৌঁছতো না, ঘরের কোণে ইঁদুর বেড়াল মরে পচে থাকলেও তার খবর পাওয়া দুষ্কর ছিল। ইউনুসের জ্বরজ্বারি লেগেই থাকতো, থেকে থেকে শেষরাতে কাশির ধমক উঠতো। তবু পাড়াটি ছাড়ে নি এক কারণে। কে তাকে বলেছিল, চামড়ার গন্ধ নাকি যক্ষ্মার জীবাণু ধ্বংস করে। দুর্গন্ধটা তাই সে অম্লানবদনে সহ্য তো করতোই, সময় সময় আপিস থেকে ফিরে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে পাশের বাড়ির নিছিদ্র দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বুকভরে নিশ্বাস নিতো। তাতে অবশ্য তার স্বাস্থ্যের কোনো উন্নতি দেখা যায় নাই।

খানাদানা না হলে বাড়ি সরগরম হয় না। তাই এক সপ্তাহ ধরে মুঘলাই কায়দায় তারা খানাদানা করে। রান্নার ব্যাপারে সকলেই গুপ্ত কেরামতি প্রকাশ পায় সহসা। নানির হাতে শেখা বিশেষ পিঠা তৈরির কৌশলটি শেষ পর্যন্ত অখ্যাদ্য বস্তুতে পরিণত হলেও তারিফ প্রশংসায় তা মুখরোচক হয়ে উঠে। গানের আসরও বসে কোন কোন সন্ধ্যায়। হাবিবুল্লাহ কোত্থেকে একটা বেসুরো হারমানিয়াম নিয়ে এসে তার সাহায্যে নিজের গলার বলিষ্ঠতার ওপর ভর করে নিশীত রাত পর্যন্ত একটি অবক্তব্য সঙ্গীতসমস্যা সৃষ্টি করে।

এ সময়ে একদিন উঠানোর প্রান্তে রান্নাঘরের পেছনে চৌকোণা আধ হাত উঁচু ইটের তৈরি কেটি মঞ্চের ওপর তুলসী গাছটি তাদের দৃষ্টিগত হয়।

সেদিন রোববার সকাল। নিমের ডাল য়িে মেছোয়াক করতে করতে দোসাব্বের উঠান পায়চারি করছিল, হঠাৎ সে তারস্বরে আর্তনাদ করে ওঠে। লোকটি এমনিতেই হুজুগে মানুষ। সামান্য কথাতেই প্রাণ-শীতল-করা রৈ– রৈ আওয়াজ তোলার অভ্যাস তার। তবু সে আওয়াজ উপেক্ষা করা সহজ নয়। শীঘ্রই কেউ কেউ ছুটে আসে উঠানে।

কী ব্যাপার?

চোখ খুলে দেখ।

কী? কী দেখবো?

সাপখোপ দেখবে আশা করেছিল বলে প্রথম তুলসী গাছটা নজরে নড়ে না তাদের। দেখছো না? এমন বেকায়দা আসনাধীন তুলসী গাছটা দেখতে পাচ্ছো না? উপড়ে ফেলতে হবে ওটা। আমরা যখন এ বাড়িতে এসে উঠেছি তখন এখানে কোন হিন্দয়ানির চিহ্ন আর সহ্য করা হবে না।

একটু হতাশ হয়ে তারা তুলসী গাছটির দিকে তাকায়। গাছটি কেমন যেন মরে আছে। গাঢ় সবুজ রঙের পাতায় খয়েরি রং ধরেছে। নিচে আগাছাও গজিয়েছে। হয়তো বহুদিন তাতে পানি পড়েনি।

কী দেখছো? মোদাব্বের হুঙ্কার দিয়ে ওঠে। বলছি না, উপড়ে ফেল!

এরা কেমন স্তব্ধ হয়ে যায়। আকস্মিক এ আবিষ্কারে তারা যেন কিছুটা হতভম্ব হয়ে পড়েছে। যে বাড়ি এত শূন্য মনে হয়েছিল, ছাদে যাওয়ার সিঁড়ির দেয়ালে কাটা হাতে লেখা ক-টা নাম থাকা সত্ত্বেও যে বাড়িটা এমন বেওয়ারিশ ঠেকেছিল, সেবাড়ির চেহারা যেন হঠাৎ বদলে গেছে। আচমকা ধরা পড়ে গিয়ে শুষ্কপ্রায় মৃতপ্রায় নগণ্য তুলসী গাছটি হঠাৎ সে বাড়ির অন্দরের কথা প্রকাশ করেছে যেন।

ভাবছো কী অত? উপড়ে ফেলো বলছি!

কেউ নড়ে না। হিন্দু রীতিনীতি এদের তেমন ভালো করে জানা নাই। তবুও কোথাও শুনেছে যে, হিন্দুবাড়িতে প্রতি দিনান্তে গৃহকর্ত্রী তুলসী গাছের তলে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালায়, গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম কর। আজ যে তুলসী গাছের তলে গজিয়ে উঠেছে, সে পরিত্যক্ত তুলসী গাছের তলেও প্রতিসন্ধ্যায় কেউ প্রদীপ দিতো। আকাশে যখন সন্ধ্যাতারা বলিষ্ঠ একাকিত্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠতো, তখন ঘনায়মান ছায়ার মধ্যে আনত সিঁদুরের নীরব রক্তাক্ত স্পর্শে একটা শান্ত-শীতল প্রদীপ জ্বলে উঠতো প্রতিদিন। ঘরে দুর্দিনের ঝড় এসেছে, হয়তো কারো জীবন প্রদীন নিভে গেছে, আবার হাসি-আনন্দের ফোয়ারাও ছুটেছে সুখ-সময়ে, কিন্তু এ প্রদীপ দেওয়া অনুষ্ঠান একদিনের জন্যও বন্ধ থাকে নাই।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

অনাশ্রিত– যাদের কোনো আশ্রয় নেই, আশ্রয়হীন। **উদয়াস্ত–** সকাল-সন্ধ্যা। **কচ্ছদেশীয়–** গুজরাটের উত্তরে অবস্থিত সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল। **কংক্রিটের পুল–** চুন-বালি-সিমেন্ট ও চুনাপাথরের মিশ্রণে তৈরি পাকা সেতু। **ক্যানভাস–** মজবুত মোটা কাপড় বিশেষ। **গুড়গুড়ি–** আলবোলা, দীর্ঘ নলবিশিষ্ট হুকাবিশেষ। **ডেকচেয়ার–** ঘরের বাইরে ব্যবহারের জন্য কাঠ বা ধাতব কাঠামোর উপর ক্যানভাস দিয়ে তৈরি আসন। **তক্‌লিফ–** দুঃখ, কষ্ট, দুর্ভোগ। **তুলো-ধুনো–** ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। **দেশভাগের হুজুগ–** ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির আবেগবশত। **না-হক–** ন্যায়সঙ্গত নয় এমন। **না-বেহক–** অন্যায় নয় এমন। **পরাহত–** ব্যাহত, পরাজিত। **পুষ্পসৌরভে–** ফুলের গন্ধে। **পুষ্পিত–** কুসুমিত, পুষ্পযুক্ত, ফুল ধরেছে এমন; এখানে কল্পনায় রূপ পেয়েছে অর্থে ব্যবহৃত। **পৃষ্ঠপ্রদর্শন–** পালিয়ে যাওয়া। **প্রশস্ত–** বিস্তৃত, বড়। **ফিকির–** ফন্দি, মতলব। **বেওয়ারিশ–** অভিভাবকহীন, দাবিদার নেই এমন। **মদির–** মত্ততা বা আকর্ষণ সৃষ্টি করে এমন। **মর্মার্থ–** আসল অর্থ, মূল কথা। **মেছোয়াক–** দাঁত মাজা। **লাটবেলাট–** গভর্নর বা অনুরূপ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ। **সরগরম–** গুলজার, পরিপূর্ণ, জমজমাট।

সারসংক্ষেপ

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের অব্যবহিত পরে পূর্ববঙ্গের কোনো একটি শহরে একটি পরিত্যক্ত বাড়ি দখল করে কলকাতা থেকে পালিয়ে আসা কয়েকজন উদ্বাস্তু মুসলিম কর্মচারি। কলকাতার ঘিঞ্জি এলাকায় কোনো রকমে তারা দুর্বিষহ জীবন যাপন করত। কলকাতার তুলনায় তাদের দখল করা বাড়িটা অনেক বড় ও খোলামেলা। দুর্দিনে দখল করে নেওয়া এই বাড়িটা উদ্বাস্তু মানুষদের কাছে বেহেশ্‌ত বলে মনে হল। হঠাৎ একদিন তারা আবিষ্কার করল বাড়ির উঠানের এক কোণে একটা তুলসী গাছ। গাছটাকে তাদের ভালো বলে মনে হলো না। গাছটা যেন যারা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে তাদের অস্তিত্বের জানান দিচ্ছে। তাই তারা গাছটাকে উপড়ে ফেলতে চাইল। কিন্তু গাছটা উপড়ে ফেলতে তাদের দ্বিধাও জাগ্রত হয় এবং এভাবে গাছটা সাময়িক বেঁচে যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মোদাব্বের কোথায় পায়চারি করছিল?

ক. জঙ্গলে খ. উঠানে

গ. তুলসি গাছের তলায় ঘ. সমুদ্র তীরবর্তী স্থানে

২. 'দিনে দুপুরে ডাকাতি' বলতে বোঝানো হয়েছে–

ক. প্রকাশ্য প্রতারণা ক. ফাঁকি দেওয়া

গ. তলব করা ঘ. পরাজিত হওয়া

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

ঐশীর মেহেদি পরার শখ থাকলেও পরতে পারে না দাদুর ভয়ে। তিনি মনে করেন মেহেদি মুসলমানেরা পরে। এই মুসলমানদের জন্যই তাদের পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে ভারতে চলে আসতে হয়েছে। তাই মুসলমানদের সংস্কৃতি তিনি সহ্য করতে পারেন না।

৩. উদ্দীপকের দাদুর চরিত্রটি 'একটি তুলসী গাছের কাহিনি' গল্পের কোন্ চরিত্রের অনুরূপ?

ক. এনায়েত খ. ইউসুফ

গ. মোদাব্বের ঘ. মকসুদ

৪. 'একটি তুলসী গাছের কাহিনি' ও উদ্দীপক অনুসারে পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে আসার কারণ হচ্ছে–

i. সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ

ii. যুদ্ধ

iii. শ্রেণিদ্বন্দ্ব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i ও ii

পাঠ-২

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- তুলসী গাছটির পরিণতি ব্যাখ্যা করতে পরবেন।
- দেশবিভাগের ফলে মানুষের জীবনে যে বিপন্নতা নেমে এসেছিল, তুলসী গাছের বিপন্নতার রূপকে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- 'একটি তুলসী গাছের কাহিনি' গল্পের নামকরণের সার্থকতা বিচার করতে পারবেন।

মূলপাঠ

যে–গৃহকর্ত্রী বছরের পর বছর এ তুলসী গাছের তলে প্রদীপ দিয়েছে সে আজ কোথায়? মতিন এক সময়ে রেলওয়েতে কাজ করতো। অকারণে তার চোখের সামনে বিভিন্ন রেলওয়ে-পট্টির ছবি ভেসে ওঠে। ভাবে, হয়তো আসানসোল, বৈদ্যবাটি, লিলুয়া বা হাওড়ায় রেলওয়ে পট্টিতে সে মহিলা কোন আত্মীয়ের ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। বিশাল ইয়ার্ডের পাশে রোদে শুকোতে– থাকা লাল পাড়ের একটি মসৃণ কালো শাড়ি সে যেন দেখতে পায়। হয়তো সে শাড়িটি গৃহকর্ত্রীরই। কেমন বিষণ্নভাবে সে শাড়িটি দোলে স্বল্প হওয়ায়। অথবা মহিলাটি কোনো চলতি ট্রেনের জানালার পাশে যেন বসে। তার দৃষ্টি বাইরের দিকে। সে দৃষ্টি খোঁজে কিছু দূরে, দিগন্তের ওপারে। হয়তো তার যাত্রা এখনো শেষ হয়

নাই। কিন্তু যেখানেই সে থাকুক এবং তার যাত্রা এখনো শেষ হয়েছে কি হয় নাই, আকাশে যখন দিনান্তের ছায়া ঘনিয়ে ওঠে তখন প্রতিদিন এ তুলসী তলার কথা মনে হয় বলে তার চোখ হয়তো ছলছল করে ওঠে।

গতকাল থেকে ইউনুসের সর্দি-সর্দি ভাব। সে বলে,

থাক না ওটা। আমরা তো তা পূজা করতে যাচ্ছি না। বরঞ্চ ঘরে তুলসী গাছ থাকা ভালো। সর্দি-কফে তার পাতার রস বড়ই উপকারী।

মোদাব্বের অন্যদের দিকে তাকায়। মনে হয়, সবারই যে তাই মত। গাছটি উপড়ানোর জন্যে কারো হাত এগিয়ে আসে না। ওদের মধ্যে এনায়েত একটু মৌলভি ধরনের মানুষ। মুখে দাড়ি, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও আছে, সকালে নিয়মিত ভাবে কুরআন-তেলাওয়াত করে। সে পর্যন্ত চুপ। প্রতি সন্ধ্যায় গৃহকর্ত্রীর সজল চোখের দৃশ্যটি তার মনেও জাগে কি?

অক্ষত দেহে তুলসী গাছটি বিরাজ করতে থাকে।

তবে এদের হাত থেকে রেহাই পেলেও এরা যে তার সম্বন্ধে পর মুহূর্তেই অসচেতনায় নিমজ্জিত হয় তা নয়। বরঞ্চ কেমন একটা দুর্বলতার ভাব, কর্তব্যের সম্মুখে পিছ-পা হলে যেমন একটা অস্বচ্ছন্দতা আসে তেমন একটা অস্বচ্ছন্দতা তাদের মনে জেগে থাকে। তারই ফলে সেদিন সান্ধ্য আড্ডায় তর্ক ওঠে। তারা বাকবিতণ্ডার স্রোতে মনের সে দুর্বলতা অস্বচ্ছন্দতা ভাসিয়ে দিতে চায় যেন। আর অন্যান্য দিনের মতো রাষ্ট্রনৈতিক-অর্থনৈতিক আলোচনার বদলে সাম্প্রদায়িকতাই তাদের প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে।

-ওরাই তো সবকিছুর মূলে, মোদাব্বের বলে। উলঙ্গ বাল্‌ব্–এর আলোয় তার সযত্নে মেছোয়াক করা দাঁত ঝকঝক করে। তাদের নীচতা হীনতা গোঁড়ামির জন্যেই তো দেশটা ভাগ হলো।

কথাটা নতুন নয়। তবু আজ সে উক্তিতে নতুন একটা ঝাঁঝ। তার সমর্থনে এবার হিন্দুদের অবিচার-অত্যাচারের অশেষ দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়। অল্প সময়ের মধ্যে এদের রক্ত গরম হয়ে ওঠে, শ্বাস-প্রশ্বাস সংকীর্ণ হয়ে আসে।

দলের মধ্যে বামপন্থী বল স্বীকৃত মকসুদ প্রতিবাদ করে। বলে, বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছ না কী? মোদাব্বেরের ঝকঝকে দাঁত ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

বাড়াবাড়ি মানে?

বামপন্থী মকসুদ আজ একা। তাই হয়তো তার বিশ্বাসের কাঁটা নড়ে। সংশয়ে দুলে দুলে কাঁটাটি ডান দিকে হেলে থেমে যায়।

কয়েকদিন পরে রান্নাঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় তুলসী গাছটা মোদাব্বেরের নজরে পড়ে। সে একটু বিস্মিত না হয়ে পারে না। তার ফলে যে আগাছা জন্মেছিল সে আগাছা অদৃশ্য হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়। যে গাঢ় সবুজ পাতাগুলি পানির অভাবে শুকিয়ে খয়েরি রং ধরেছিল, সে পাতাগুলি কেমন সতেজ হয়ে উঠেছে। সন্দেহ থাকে না যে তুলসী গাছটির যত্ন নিচ্ছে কেউ। খোলাখুলিভাবে না হলেও লুকিয়ে লুকিয়ে তার গোড়ায় কেউ পানি দিচ্ছে। মোদাব্বেরের হাতে তখন একটি কঞ্চি। সেটি সাঁ করে কচুকাটার কায়দায় সে তুলসী গাছের ওপর দিয়ে চালিয়ে দেয়। কিন্তু ওপর দিয়েই। তুলসীগাছটি অক্ষত দেহেই থাকে।

অবশ্য তুলসী গাছের কথা কেউ উল্লেখ করে না। ইউনুসের সর্দি-সর্দি ভাবটা পরদিন কেটে গিয়েছিল। তুলসী পাতার রসের প্রয়োজন হয় নাই তার।

তারা ভেবেছিল ম্যাকলিওড স্ট্রিট খানসামা লেন ব্লকম্যানের জীবন সত্যিই পেছনে ফেলে এসে প্রচুর আলো হওয়ার মধ্যে নতুন জীবন শুরু করেছে। কিন্তু তাদের ভুলটা ভাঙতে দেরি হয় না। তবে শুধু ততখানিই দেরি হয় যতখানি দরকার, সে বিশ্বাস দৃঢ় প্রমাণিত হবার জন্যে। ফলে আচম্বিত আঘাতটা প্রথমে নিদরুণই মনে হয়।

সেদিন তারা আপিস থেকে সরাসরি বাড়ি ফিরে সকালের পরিকল্পনা মোতাবেক খিচুড়ি রান্নার আয়োজন শুরু করেছে এমন এসময় বাইরে সিঁড়িতে ভারি জুতার মচমচ আওয়াজ শোনা যায়। বাইরে একবার উঁকি দিয়ে মোদাব্বের ক্ষিপ্রপদে ভেতরে আসে।

পুলিশ এসেছে আবার। সে ফিসফিস করে বলে।

পুলিশ? আবার কেন পুলিশ? ইউনুস ভাবে, হয়তো রাস্তা থেকে ছ্যাঁচড়া চোর পালিয়ে এসে বাড়িতে ঢুকেছে এবং তারই সন্ধানে পুলিশের আগমন হয়েছে। কথাটা মনে হতেই নিজের কাছেই তা খরগোশের গল্পের মতো ঠেকে। শিকারির সামনে আর পালাবার পথ না পেয়ে হঠাৎ চোখ বুঝে বসে পড়ে খরগোশ ভাবে, কেউ তাকে আর দেখতে পাচ্ছে না। আসলে তারাই কি চোর নয়? সব জেনেও তারাই কি সত্য কথাটা স্বীকার না করে এ বাড়িতে একটি অবিশ্বাস্য মনোরম জীবন সৃষ্টি করেছে নিজেদের জন্য?

পুলিশ দলের নেতা সাবেকি আমলের মানুষ। হ্যাট বগলে চেপে তখন সে দাগ-পড়া কপাল থেকে ঘাম মুছছে। কেমন একটা নিরীহ ভাব। তার পশ্চাতে বন্দুকধারী কনেস্টবল দুটিকেও মস্ত গোঁফ থাকা সত্ত্বেও নিরীহ মনে হয়। তাদের দৃষ্টি ওপরের দিকে। তারা যেন কড়িকাঠ গোণে। ওপরের ঝিলিমিলির খোপে একজোড়া কবুতর বাসা বেঁধেছে। হয়তো সে কবুতর দুটিকেই দেখে চেয়ে। হাতে বন্দুক থাকলে নিরীহ মানুষেরও দৃষ্টি পড়ে পশু-পক্ষীর দিকে।

সবিনয়ে মতিন প্রশ্ন করে, কাকে দরকার?

আপনাদের সবাইকে। পুলিশদের নেতা একটু খনখনে গলায় ঝট করে উত্তর দেয়। আপনারা বেআইনীভাবে এ বাড়িটা কব্জা করেছেন।

কথাটা না মেনে উপায় নাই। ওরা প্রতিবাদ না করে সরল চোখে সামান্য কৌতুহল জাগিয়ে পুলিশদের নেতার দিকে চেয়ে থাকে।

চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে বাড়ি ছাড়তে হবে। সরকারের হুকুম।

এরা নীরবে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। অবশেষে মোদাব্বের গলা সাফ করে প্রশ্ন করে, কেন, বাড়িওয়ালা নালিশ করেছে নাকি?

অ্যাকাউন্টস আপিসের মোটা বদরুদ্দিন গলা বাড়িয়ে কনেস্টবল দুটির পেছনে একবার তাকিয়ে দেখে বাড়িওয়ালার সন্ধানে। সেখানে কেউ নেই। তবে রাস্তায় কিছু লোক জড়ো হয়েছে। অন্যের অপমান দেখার নেশা বড় নেশা।

কোথায় বাড়িওয়ালা? না হেসেই গলায় হাসি তোলে পুলিশ দলের নেতা।

এদের একজনও হেসে ওঠে। একটা আশার সঞ্চার হয় যেন।

তবে?

গভর্নমেন্ট বাড়িটা রিকুইজশন করেছে।

এবার হাসি জাগে না। বস্তুত অনেকক্ষণ যেন কারো মুখে কোনো কথা সরে না। তারপর মকসুদ গলা বাড়ায়। আমরা কি গভর্নমেন্টের লোক নই?

এবার কনেস্টবল দুটির দৃষ্টিও কবুতর কড়িকাঠ ছেড়ে মকসুদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়।

তাদের দৃষ্টিতে সামান্য বিস্ময়ের ভাব। মানুষের নির্বুদ্ধিতায় এখনো তারা চমকিত হয়।

তারপর প্রকাণ্ড সে বাড়িতে অপর্যাপ্ত আলোবাতাস থাকলেও একটা গভীর ছায়া নেবে আসে। প্রথমে অবশ্য তাদের মাথায় খুন চড়ে। নানারকম বিদ্রোহী ঘোষণা শোনা যায়। তারা যাবে না কোথাও, ঘরের খুটি ধরে পড়ে থাকবে; যাবে তো লাশ হয়ে যাবে। তবে মাথা শীতল হবে দেরি হয় না। তখন গভীর ছায়া নেবে আসে সর্বত্র। কোথায় যাবে তারা?

পরদিন মোদাব্বের যখন এসে বলে তাদের মেয়াদ চব্বিশ ঘণ্টা থেকে সাতদিন হয়েছে তখন তারা একটা গভীর স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লেও সে-ঘন ছায়াটা নিবিড় হয়েই থাকে। এবার মোদাব্বের পুলিশ সাব-ইনস্পেক্টরের দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে তার আত্মীয়তার কথা বলে না। তবু না বলা কথাটা সবাই মেনে নেয়।

তারপর দশম দিনে তারা সদবলবলে বাড়ি ত্যাগ করে চলে যায়। যেমনি ঝড়ের মতো এসেছিল, তেমনি ঝড়ের মতোই উধাও হয়ে যায়। শূন্য বাড়িতে তাদের সাময়িক বসবাসের চিহ্নস্বরূপ এখানে-সেখানে ছিটিয়ে থাকে খবর কাগজের ছেঁড়া পাতা, কাপড় ঝোলাবার একটা পুরোন দড়ি, বিড়ি-সিগারেটের টুকরো, একটা ছেঁড়া জুতোর গোড়ালি।

উঠানোর শেষে তুলসী গাছটা আবার শুকিয়ে উঠেছে। তার পাতায় খয়েরি রং। সেদিন পুলিশ আসার পর থেকে কেউ তার গোড়ায় পানি দেয় নি। সেদিন থেকে গৃহকর্ত্রীর ছলছল চোখের কথাও আর কারো মনে পড়ে নি।
কেন পড়েনি সে কথা তুলসী গাছের জানবার কথা নয়, মানুষেরই জানবার কথা।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

আচম্বিত– হঠাৎ, আকস্মিক। **ইয়ার্ড–** স্টেশনসংলগ্ন চত্বর। **কলা দেখানো–** আলঙ্কারিক অর্থে ব্যবহার, এখানে ফাঁকি দেওয়া অর্থে। **কড়িকাঠ–** ছাদের তলায় দেওয়া আড়াআড়ি লম্বা কাঠ। **দিনান্তের–** দিন শেষের, সন্ধ্যাবেলার। **দিনে দুপুরে ডাকাতি–** প্রকাশ্যে প্রতারণা ও মিথ্যাচার; ডাকাতির মতো দুঃসাহসিক কাজ। **বামপন্থী–** সাম্যবাদী, প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের অনুসারী। **ভদ্রতার বালাই–** সাধারণ সৌজন্যবোধ। **মোতাবেক–** অনুসারে, অনুযায়ী। **সাম্প্রদায়িকতা–** সম্প্রদায়গত স্বার্থচেতনা ও ক্রিয়াকাণ্ড। **রিকুইজিশন–** কোনো কিছু চেয়ে লিখিত ফরমায়েশ, তলব করা। **হ্যাট–** টুপি।

সারসংক্ষেপ

তুলসী গাছটা নিয়ে উদ্বাস্তু মানুষদের কৌতূহলের শেষ নেই। কেউ গাছটকে উপড়ানোর কথা বলেছে, কেউবা বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছে গাছটাকে। হঠাৎ লক্ষ করা গেল, সকলের অজান্তে কেউ একজন গাছটার পরিচর্যা করতে আরম্ভ করেছে। কিছুদিন পর সরকারের নির্দেশে বেআইনী দখলদারদের হাত থেকে বাড়িটাকে উদ্ধার করল পুলিশ– উদ্বাস্তু মানুষদের করা হল উচ্ছেদ। জনমানবহীন শূন্য বাড়িটাতে রইল কেবল এদিক সেদিক ছড়ানো পরিত্যক্ত আবর্জনা, আর সেই তুলসী গাছটা। যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে অসংখ্য মানুষের শান্ত জীবন, তুলসী গাছটাও যে তারই শিকার– অসহায় বোবা গাছটা তা জানবে কী করে!

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫. তুলসী গাছটিতে বহুদিন পানি পড়েনি কেন?

ক. অনাবৃষ্টির কারণে — খ. নিষেধাজ্ঞা থাকায়

গ. হিন্দুয়ানির চিহ্ন বলে — ঘ. মালিক না থাকায়

৬. 'বামপন্থী' বলতে বোঝায়–

ক. নির্বুদ্ধিতা — খ. সাম্যবাদী

গ. প্রতিবাদী — গ. সাম্প্রদায়িকতা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

তা নয়ত কি হইবেন? বাংলা হৈলে তো সব হিন্দু হৈয়া গেল, এ সব তো এনাদের জন্যই। এনারাই আমাগো ছাওয়ালদের মাথা বিগরাইয়া দিছে।

৭. উদ্দীপকটি 'একটি তুলসী গাছের কাহিনি' গল্পের কোন বাক্যের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক. তাদের নীচতা হীনতা গোঁড়ামির জন্যেই তো দেশটা ভাগ হলো।

খ. হিন্দু রীতিনীতি এদের তেমন ভাল করে জানা নাই।

গ. আমরা তো তা পূজা করতে যাচ্ছি না।

ঘ. অক্ষত দেহে তুলসী গাছটি বিরাজ করতে থাকে।

৮. উদ্দীপক ও 'একটি তুলসী গাছের কাহিনি' গল্পে প্রকাশিত হয়েছে–

ক. অবিচার-অত্যাচার — খ. সাম্প্রদায়িকতা

গ. সঙ্গীতসমস্যা — ঘ. অধিকারস্বত্ব

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৯. সাব-ইনস্পেক্টরের দ্বিতীয় বউ কার এক রকমের আত্মীয়?

ক. মোদাব্বের — খ. কাদের

গ. এনায়েত — ঘ. বদরুদ্দিন

১০. উদ্বাস্তু মানুষকে দখলকৃত বাড়ি ছাড়তে হয়েছে যে কারণে–

ক. মালিক ফিরে আসায় খ. গভর্নমেন্ট রিকুইজিশন করায়
গ. অন্য দখলকারী চলে আসায় ঘ. হিন্দু বাড়ি হওয়ার কারণে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

১৯৭১ সালে পাক-হানাদার বাহিনীর আক্রমণের মুখে অদ্রি বাবা-মায়ের সঙ্গে ভারতের শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়। সেখানে তার মনে পড়ে নিজ গ্রামের কথা। গ্রামে তার একটি গোলাপের বাগান ছিল। বড় যত্ন করত। যুদ্ধের নয়টি মাস সে ভারতে কাটিয়েছে গ্রামে ফেরার আকুলতা নিয়ে।

১১. উদ্দীপকের 'অদ্রি' 'একটি তুলসী গাছের কাহিনি' গল্পে কোন চরিত্রে ফুটে উঠেছে?

ক. বদরুদ্দিন খ. মোদাব্বের
গ. মতিন ঘ. ইউনুস

১২. উদ্দীপক ও 'একটি তুলসী গাছের কাহিনি' গল্পে মানুষের সংকট–

ক. অস্তিত্ব সংকট খ. দুর্ভিক্ষ
গ. বিত্তবাসনা ঘ. আর্থিক সংকট

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ :

সোহরাব আলি পেশায় একজন স্কুল শিক্ষক ছিলেন। বহরমপুরের স্থানীয় স্কুলে শিক্ষার্থীদের বোটানি পড়াতেন। সেখান থেকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তাড়িত হয়ে তিনি সপরিবারে চলে আসেন ঢাকায়। নিজের অস্তিত্বে সেখানকার দাঙ্গা বিধ্বস্ত দিনের বীভৎস দৃশ্য তাকে মাঝে মাঝে তাড়া করে বটে কিন্তু তার পরেও ফেলে আসা জন্মভিটের স্মৃতি সোহরাব আলি ও তার স্ত্রী আফসানা কিছুতেই ভুলতে পারেন না। তবে স্মৃতি ভুলতে না পারলেও ঢাকার বাড়িটা ধীরে ধীরে তাদের কাছে সহজ হয়ে উঠে।

ক. রোগাপটকা ইউনুস আগে কোথায় থাকত?
খ. 'এমন বাড়ি পাওয়া নিতান্ত সৌভাগ্যের কথা।' –কেন? বুঝিয়ে বলুন।
গ. উদ্দীপকের সোহরাব আলির সঙ্গে 'একটি তুলসী গাছের কাহিনি' গল্পে কার সাদৃশ্য রয়েছে? –আলোচনা করুন।
ঘ. "দেশ বিভাগে রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের শিকার অসহায় মানুষের জীবনচিত্রই উদ্দীপক ও 'একটি তুলসী গাছের কাহিনি' গল্পের বিষয়বস্তু।" –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন-১

ক.

রোগাপটকা ইউনুস আগে কলকাতায় ম্যাকলিওড স্ট্রিটে থাকত।

খ.

উদ্বাস্তু মানুষদের একটি মনোরম বাড়ি পাওয়া 'নিতান্ত সৌভাগ্যের কথা' বলে মনে হয়েছে।

বাসস্থান মানুষের নিকট নিরাপদ আশ্রয়। দেশভঙ্গের হুজুগে কলকাতা থেকে বাস্তচ্যুত একদল মানুষ গল্পে বর্ণিত শহরে একটি ডেরার সন্ধানে উদয়াস্ত ঘুরে বেড়ায়। হঠাৎ একদিন তারা একটি পরিত্যক্ত বাড়ি পেয়ে যায়। প্রকাণ্ড বাড়িটি লড়াই না করেই দখল করতে পারায় আশ্রয়হীন মানুষদের নিকট তা নিতান্ত সৌভাগ্যের কথা বলে মনে হয়।

গ.

উদ্দীপকের সোহরাব আলির সঙ্গে 'একটি তুলসী গাছের কাহিনি' গল্পে মতিন, কাদের, আমজাদ ও মকসুদের সাদৃশ্য রয়েছে। ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্র জন্মলাভ করে।

ফলে সাম্প্রদায়িক আবেগবশত দুদেশেরই সাধারণ মানুষের জীবনে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। দুটি দেশেই ছড়িয়ে পড়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও হাঙ্গামা। আপন ভূমি থেকে ছিন্নমূল হয়ে অনেক মানুষ উদ্বাস্তু জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। অনেকে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে একদেশ থেকে অন্য দেশে দেশান্তরি হতে থাকে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সোহরাব আলি বহরমপুরে বসবাস করতেন। সেখানে তিনি স্কুলে শিক্ষার্থীদের বোটানি পড়াতেন। স্কুল শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও সোহরাব আলি দেশভঙ্গের হুজুগে দাঙ্গার কবলে পড়ে বহরমপুর থেকে বিতাড়িত হয়ে ঢাকায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি ঢাকায় আস্তানা গড়লেও নিজ জন্মভিটে বহরমপুরের স্মৃতি কখনো ভুলতে পারেননি। অন্যদিকে

‘একটি তুলসী গাছের কাহিনি’ গল্পে দেখা যায়, মতিন, আমজাদ, কাদের, ইউনুস, মকসুদ– এরা দাঙ্গা কবলিত হয়ে নতুন শহরে এসে আশ্রয় নিয়েছে। এদের অনেকেই কলকাতায় ব্লকম্যান লেন-এ খালাসি পট্টিতে, বৈঠকখানায় দফতরিদের পাড়ায়, সৈয়দ সালেহ লেন-এ তামাক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বা কমরু খানসামা লেন-এ অকথ্য দুর্গন্ধ নোংরার মধ্যে দিন কাটিয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সোহরাব আলির সঙ্গে কলকাতা থেকে উদ্বাস্তু মতিন, আমজাদ, কাদের, ইউনুস ও মকসুদের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ.

উদ্দীপক ও ‘একটি তুলসী গাছের কাহিনি’ গল্পে দেশভাগের প্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষের দুর্বিষহ জীবনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে– মন্তব্যটি যথার্থ হয়েছে।

দেশভাগের সময় অবিভক্ত বাংলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছিল প্রায় নিয়মিত দৃশ্য। এ সময়ে সমাজের দু’একজন প্রভাবশালী সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন মানুষ সমগ্র জনপদকে বিষিয়ে তোলে। দাঙ্গার ফলে সে সময়কার সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। শুরু হয় মানুষ হত্যা আর অন্যের জমি দখলের প্রবণতা। নিজ জন্মভূমি থেকে উদ্বাস্তু হয় অনেক মানুষ। অনেকে প্রাণে বেঁচে গেলেও উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা তাদের গ্রাস করে। রাজনৈতিক কূটকৌশলের শিকার হয়ে অসংখ্য মানুষের শান্ত জীবন অসহিষ্ণু ও বিপর্যস্ত হয়।

‘একটি তুলসী গাছের কাহিনি’ গল্পে দেখা যায়, দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরেই কলকাতা থেকে আগত কয়েকজন উদ্বাস্তু নতুন শহরে একটি পরিত্যক্ত বাড়ি দখল করে। নতুন বাড়িটি পেয়ে তারা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। কেননা কলকাতায় তারা এতদিন একটি ঘিঞ্জি গলিতে কোনো রকমে দুর্বিষহ জীবনযাপন করলেও উদ্বাস্তু জীবনের উদ্বেগ আর উকণ্ঠা তাদের গ্রাস করেছিল। নতুন বাড়িটিকে তাদের কাছে বেহেশতখানা বলে মনে হয় । কিন্তু একদিন সরকারি নির্দেশে বাড়িটির বেআইনি দখল থেকে তাদের উচ্ছেদ হতে হয়। উদ্দীপকেও একটি পরিবারকে রাজনৈতিক হয়রানির ঘটনা রয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শিকার হয়ে সোহরাব আলি নিজ জন্মভূমি বহরমপুর ছেড়ে ঢাকায় চলে আসেন। ঢাকায় সোহরাব আলি ও তার স্ত্রী আফসানা কিছুটা সহজ হয়ে এলেও বহরমপুরের স্মৃতি কিছুতেই ভুলতে পারেন না।

উদ্দীপকে বর্ণিত হয়েছে সোহরাব আলি ও তার স্ত্রী আফসানার জীবনে ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক দুর্বিপাকের কথা। দাঙ্গাপীড়িত হবার কারণে তাদেরকে দেশ ছেড়ে ঢাকা শহরে এসে আবাস গড়তে হয়েছে। ‘একটি তুলসী গাছের কাহিনি’ গল্পেও গল্পকার কয়েকজন উদ্বাস্তু কর্মচারির কথা বলেছেন। দেশভঙ্গের হুজুগে তাদেরকেও কলকাতা থেকে পাততাড়ি গুটাতে হয়। তাই বলা যায়, দেশ বিভাগে রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের শিকার অসহায় মানুষের জীবনচিত্রই উদ্দীপক ও ‘একটি তুলসী গাছের কাহিনি’ গল্পে বর্ণিত হয়েছে।

অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বনশ্রী থেকে বিতাড়িত হয়েছেন বটে সর্বানন্দ বাচস্পতি। কিন্তু তিনি কখনো সাম্প্রদায়িক হতে পারেননি। সাম্প্রদায়িকতাকে আজীবন ঘৃণার বিষয়রূপেই দেখেছেন। হিন্দু মহাসভার সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও মুসলিম বিদ্বেষী প্রচারণা কীভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশ বিভাগের কারণে পরিণত হয় তা বুঝতে তার অসুবিধা হয় না। তিনি এও বোঝেন যে সবাই সাম্প্রদায়িক নয়। একজন দুজন মানুষই সমগ্র জনপদকে বিষিয়ে তোলে। কাপাসিয়ার এনামুলের সঙ্গেই তার ঘনিষ্ঠতা দেখা যায় সবচেয়ে বেশি। এনামুলের উপকারের জন্য পশ্চিমবাংলায় আসার পরও কৃতজ্ঞতা জানাতে তিনি মোটেই কার্পণ্য করেননি।

ক. তুলসী গাছটি প্রথমে কার চোখে পড়েছিল?

খ. বাড়ির বাসিন্দা পরিবর্তন তুলসী গাছটির জীবনে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল?

গ. উদ্দীপকের অসাম্প্রদায়িক চেতনা ‘একটি তুলসী গাছের কাহিনি’ গল্পে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে?

ঘ. “উদ্দীপক ও ‘একটি তুলসী গাছের কাহিনি’ গল্পে তৎকালীন সমাজের ছবি ফুটে উঠেছে।” –মন্তব্যটি মূল্যায়ন করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খ ২. ক ৩. গ ৪. ক ৫. ঘ ৬. খ ৭. ক ৮. খ ৯. খ ১০. খ ১১. গ ১২. খ

আমিনা ও মদিনার গল্প

সেলিনা হোসেন

ভূমিকা

সেলিনা হোসেনের *গল্পসমগ্র* (২০০২) থেকে 'আমিনা ও মদিনার গল্প' শীর্ষক রচনাটি সংকলিত হয়েছে। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালি নারীদের উপর পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মম নির্যাতনের ছবি আলোচ্য গল্পটিতে লেখক অসামান্য দক্ষতায় তুলে ধরেছেন।

সাধারণ উদ্দেশ্য

সেলিনা হোসেনের 'আমিনা ও মদিনার গল্প' রচনাটি পাঠ করে আপনি–

- ছোটগল্প হিসেবে 'আমিনা ও মদিনার গল্প' –এর সার্থকতা বিচার করতে পারবেন।
- মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালি নারীদের ওপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্যাতনের বর্ণনা করতে পারবেন।
- আমিনা ও মদিনার চরিত্র ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পাকিস্তানি সৈন্যদের বর্বরতা এবং পাশবিক আচরণ তুলে ধরতে পারবেন।

পাঠ-১

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- আমিনা ও মদিনার জন্মের কাহিনি বলতে পারবেন।
- আমিনা ও মদিনাকে আর্মি কীভাবে ধরে নিয়ে গেল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- আমিনা ও মদিনার পিতা মুয়াজ্জিন আল-আমিনের মানসিক অবস্থা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

জোহরের নামাযের ওক্ত হয়েছে। মুয়াজ্জিন আল-আমিনের দুই কন্যা আমিনা ও মদিনা বদনা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। পিতাকে অজুর পানি ঢেলে দেবে।

বৈশাখ মাস। কড়া রোদে চারদিক খাঁ খাঁ করছে। উঠোনে দুবার ধুলোর ঘূর্ণন উঠেছে। মেয়েরা আঁচল দিয়ে চোখ-মুখ ঢাকে। উঠোনের পুব কোণে বুড়ো কাঁঠাল গাছ থেকে ঝরে যাওয়া শুকনো পাতা উড়ে এসে পড়ে ওদের পায়ে। ওরা ভ্রূক্ষেপ করে না। বাবার অজু না হওয়া পর্যন্ত কোনো কিছু নিয়েই চঞ্চল হতে ওরা শেখেনি। একটু পর কাঠের খড়ম পায়ে ঠক ঠক শব্দ করতে করতে মুয়াজ্জিন এসে কাঠের জলচৌকির ওপর অজু করতে বসে। টুপিটা খুলে মদিনার হাতে দেয়। মদিনা বলে, আব্বা টুপিটা ময়লা হয়েছে ধুয়ে দেই? মুয়াজ্জিন স্নেহের হাসি হাসে, হ্যাঁ মা দে। আজ না হয় আর একটা টুপি নিয়ে মসজিদে যাব।

আব্বাজান আমি আপনার জন্য কুশ দিয়ে টুপি বানাচ্ছি। বিকেলের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। আপনি মাগরেবের নামায পড়তে পারবেন সে টুপি দিয়ে।

মুয়াজ্জিন খুশি হয়ে মাথা নেড়ে মেয়েদের দিকে তাকায়। ওরা মাথায় কাপড় দিয়েছে, গায়ে পুরো হাতের ব্লাউজ, দৃষ্টি নিচের দিকে। মেয়ে দু'টো ভারি লক্ষ্মী। নিয়মিত নামায-রোযা করে। কুরআন শরিফ খতম করে। নম্র, ভদ্র। মুখে রা নেই। চোখ

তুলে কথা বলে না। আল-আমিন মনে মনে আল্লাহর কাছে শোকর জানিয়ে অজু করতে বসে। গাঁয়ের লোক জানে এ-গাঁয়ে আমিনা ও মদিনার মতো রূপবতী কেউ নয়। মেয়েরা এতই সংযত যে এখন পর্যন্ত কোনো দিন কোনো যুবকের দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছে বলে মুয়াজ্জিন শোনে নি। ওদের মা ওদের দিকে কড়া নজর রাখে। এখন মুয়াজ্জিন ভালো পাত্রের অপেক্ষায় আছে। পেলেই বিয়ে দিয়ে দেবে।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে মুয়াজ্জিনের স্ত্রী জোহরা বিবি মেয়েদের বিয়ের জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে। রাত-দিন স্বামীকে তাগাদা দেয়, একটা ব্যবস্থা করুন। বয়স্ক মেয়েদের এ সময় ঘরে রাখা ঠিক নয়। আপনি কালক্ষেপণ করবেন না।

স্ত্রীর আশঙ্কায় মুয়াজ্জিনও কেঁপে ওঠে, কিন্তু একই সঙ্গে গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বলে, পছন্দমতো পাত্র তো পাচ্ছি না। জোয়ান ছেলেগুলো যুদ্ধ নিয়ে মেতে উঠছে। একদল মুক্তিযোদ্ধা হয়ে ভারতের দালালি করতে চলে গেছে। আর একদল রাজাকার হয়ে পাকিস্তান রক্ষা করছে। কেউ বিয়ের কথা ভাবছে না। স্বামীর দীর্ঘ নিঃশ্বাসে অভিভূত হয়ে জোহরা বিবি কপাল চাপড়ে আর্তনাদ করে, হায় আল্লা আমার মেয়ে দু'টির কী হবে।

ষোড়শী আমিনা ও মদিনা অন্য ঘরে বসে মায়ের বিলাপ শুনতে পায়। দু'জনে শিউরে ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে আয়াতাল কুরছি পড়ে নিজেদের বুকে ফুঁ দেয়। পরক্ষণে পিতার দরাজ কণ্ঠ ভেসে আসে দু'জনের কানে, আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা রাখ বিবি। আমি জীবনে কোনোদিন ঈমান নষ্ট করিনি, গুনাহর কাজ করিনি। মেয়েরাও কখনও বেশরম কাজ করেনি। ওদের নসিব মন্দ হবে না বিবি।

পিতার এমন নিশ্চিত নির্ভার কণ্ঠ শুনে দু'বোনের স্বস্তি ফিরে আসে। ওরা অকারণে উদ্বিগ্ন, চিন্তিত হতে চায় না। ওরা দেখেছে এসব সময়ে ওদের চেহারার লাবণ্যে কালো ছায়া পড়ে। আয়না দেখতে ইচ্ছে হয় না।

আব্বাজান।

দু'জনে একই সঙ্গে পিতাকে ডাকে। ওরা বুঝতে পারে ওদের পিতা মুহূর্তের জন্য আনমনা হয়েছে। খাঁটি মুসলমান অজু করার সময় আনমনা হবে কেন?

মেয়েদের দরদ-মাখা কণ্ঠে মুয়াজ্জিন অজু করার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। প্রথমে ডান হাতের কব্জি, তারপর বাম হাতের কব্জি তিনবার কুলকুচার পর নাসারন্ধ্র ধৌত করার সময় বাড়ির উঠোনে তিনজন মিলিটারি এসে দাঁড়ায়। ওরা প্রায় নিঃশব্দে এসেছে। বুটের তেমন শব্দ হয়নি কিংবা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তেও এগিয়ে আসেনি, ওদের দেখে আল-আমিন মুয়াজ্জিন অজু করা ভুলে গিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে, আমিনার হাতের বদনা থেকে পানি পড়া বন্ধ হয়ে যায়। মুয়াজ্জিন অজু শেষ না করেই জলচৌকির ওপর দাঁড়িয়ে গদগদ কণ্ঠে বলে, আইয়ে হুজুর, আইয়ে।

পাকিস্তানি সেনা তিনজন মুয়াজ্জিনের দিকে ভ্রূক্ষেপ করে না। আমিনা ও মদিনা জড়সড়ভাবে দাঁড়িয়ে মাটির দিকে মুখ নিচু করে আছে। ওরা বুঝি সেই স্থান থেকে দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ার কথা ভুলে গেছে। তিনজন পাকিস্তানি সেনার মধ্যে একজন দু'পা এগিয়ে মদিনার থুতনি ধরে মুখ উঁচু করে বলে, বহুৎ খুব সুরত লাড়কি।

মুয়াজ্জিন আল-আমিনের চোখের সামনে ভরদুপুর মুছে গিয়ে জ্যোৎস্না প্লাবিত রাত্রি জেগে ওঠে। এমন অলৌকিক দৃশ্যের মধ্যে ওর ঘূর্ণি বইতে থাকে এবং শুনতে পায় জোহরা বিবির তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। সে আর্তনাদ বেগে প্রবাহিত হতে থাকলে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় জ্যোৎস্না প্লাবিত রাত। যেন চারদিকে কারবালার হাহাকার উত্থিত এবং পতিত হতে থাকে। মুয়াজ্জিন আল-আমিন হুড়মড়িয়ে জলচৌকি থেকে নেমে একজনের পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে বলে, হুজুর আপভি মুসলমান হামভি মুসলমান। হাম মসজিদ কা মুয়াজ্জিন হ্যায়। আযান দিতা হু।

বহুত আচ্ছা। হামলোক সামাজ গিয়া তুম সাচ্চা মুসলমান হ্যায়। বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা।

হাঁ হুজুর হামলোক সাচ্চা মুসলমান। মেরা দোনো লাড়কি নামায পড়তা, রোযা রাখতা, কুরআন তেলাওয়াৎ করতা জানতি হ্যায়।

হামলোক সামাজ গিয়া তোমহারা দোনো লাড়কি বুহৎ আচ্ছি মাল হ্যায়। গান্ধা নেহি।

মুয়াজ্জিনের মাথার ভেতর ঘূর্ণি প্রবল হয়ে ওঠে। তিনজন পাকিস্তানি আর্মির উল্লাসের হা-হা হাসি বয়ে যায় বোশেখ মাসের ঘূর্ণির মতো।

সে হাসি শুনে মুয়াজ্জিন ক্ষিপ্রগতিতে উঠে দাঁড়ায়। দু'বোনের সামনে দাঁড়াবার আগেই একজন ওকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। জলচৌকির কোণায় মাথা ঠুকে ফুলে ওঠে কপাল এবং চোখের কোণা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে। আল-আমিন মুয়াজ্জিন এত কিছু ভ্রূক্ষেপ না করে আবার ক্ষিপ্রগতিতে উঠে দাঁড়ায়। ততক্ষণে পাকসেনা তিনজন আমিনা ও মদিনাকে ঘিরে ধরেছে। ওরা দু'বোন কারো দিকেই তাকায়নি, দু'জনের দৃষ্টি মাটিতে নিবদ্ধ, একবার পিতাকে টেনে তোলার জন্য নড়ে উঠেছিল। কিন্তু ততক্ষণে তিনজন মানুষ ওদের আড়াল করে ফেলেছে। পুরুষ মানুষের শরীরের অভিজ্ঞতা ওদের নেই। কিন্তু এত কাছাকাছি তিনজন মানুষের উপস্থিতি ওরা অনুভব করে। প্রবল কম্পনে ওদের হাত থেকে বদনা এবং টুপি পড়ে যায়। পিতার টুপিটা মদিনার পায়ের কাছে পড়ে গেলে এক ধরনের অপরাধী চেতনায় ওর দৃষ্টি ঘোলাটে হতে থাকে। ও ক্ষিপ্র হাতে টুপিটা তোলার সময় পায় না। একজন ওর হাত চেপে ধরে টান দেয়। টুপিটা পায়ে মড়িয়ে ও পাকসেনার বুকের কাছাকাছি চলে আসে। আর একজন পায়ের কাছে গড়াতে থাকা বদনাটা লাথ্থি দিয়ে দূরে সরিয়ে আমিনার কাঁধে হাত রাখে। ওদের গদগদ কণ্ঠ থেকে থুতু-লালা-ফেনাসহ বারবার উচ্চারিত হতে থাকে, বহুত খুব সুরত, বহুত খুব সুরত।

অল্প সময়ের মাঝে ঘটে যাওয়া এত কিছুর মাঝে বিলাপ করতে করতে ছুটে আসে জোহরা বিবি।

হুজুর আপনারা আমাদের বাপ-মা হুজুর, হুজুর, হুজুর হু...।

হট যাও।

বুটের লাথিতে জোহরা বিবির মাথা ফেটে রক্ত ছোটে। মুয়াজ্জিন আল-আমিন কোনো একটা কিছু বলা বা করার উপক্রম করতেই ওরা তার পিঠে রাইফেলের বাট দিয়ে বাড়ি মারে। উঠোনে চিৎ হয়ে পড়ে যায় মুয়াজ্জিন। আর উঠতে পারে না।

আমিনা ও মদিনাকে নিয়ে চলে যায় সৈনিকরা। ওরা চিৎকার করতে পারে না, কারণ ওরা চিৎকার করতে শেখেনি। ওরা জোরে কাঁদতে পারে না, পরপুরুষে কণ্ঠ শুনবে বলে ওরা কখনো উচ্চৈঃস্বরে কাঁদেনি। ওরা জানে বিপদে আয়াতাল কুরছি পড়তে হয়, তিনবার দরূদ পড়ে বুকে ফুঁ দিতে হয়। ওরা সেটাও করতে পারে না, ভয়ে ওদের বুক শুকিয়ে গেছে, জিহ্বা আড়ষ্ট। ভরদুপুর, চারদিকে খোলা মাঠ, সবুজ ধানের মাথা দুলছে, মেঠো পথে হেঁটে যেতে যেতে ওরা ভাবে কতদূর যেতে হবে? এ পথের কি শেষ আছে? পাশাপাশি হাঁটছে বলে দু'জনে শক্ত করে নিজেদের হাত চেপে ধরে এবং সঙ্গে সঙ্গে দু'জনের ভাবনাগুলো সমান্তরাল হয়ে যায়। এখন ওদের মাথায় ঘোমটা নেই। পাকসেনারা বারবার মুখ দেখবে বলে ওদের ঘোমটা নিজেরাই ফেলে দিয়েছে। ওদের চুল বাতাসে উড়ছে। ওদের বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে গ্রাম, নিজেদের এ গ্রাম ওরা কখনো এভাবে দেখেছে বলে মনে পড়ে না। এভাবে দেখতে ওদের খুব খারাপ লাগছে। দু'বোনের মনে হয় গ্রামটা উদোম। তিনজন সেনা কিছুক্ষণ পরপর ওদের মুখে উপর মুখ আনে আর বলে, বহুত খুব সুরত লাড়কি। মাশ আল্লাহ। কথা বলার সময় ওদের মুখ থেকে থুতু ছিটকে আসে। দু'বোনের বিস্ফারিত দৃষ্টি বিস্তৃত হতে থাকে। ওরা চোখের পাতা বন্ধ করতে পারে না। দু'জনেই ভয়ে আতঙ্কে আড়ষ্ট হতে হতে ভাবে, এ চোখ দিয়ে উলঙ্গ গ্রাম শুধু না দোযখও দেখতে হবে। ওদের চোখের পাতা আর কোনো দিন বন্ধ হবে না। খাঁখাঁ ভরদুপুরে মেঠো পথে লোক চলাচল নেই। ওদের চোখের সামনে থেকে রোদ মুছে গিয়ে ভেসে ওঠে এক অদ্ভুত জ্যোৎস্না। সেই জ্যোৎস্নায় তিনজন সৈনিকের মুখ পিতার কাছ থেকে শোনা ইবলিশের মতো প্রতিভাত হতে থাকে। যেহেতু ওরা চোখের পাতা আর বন্ধ করতে পারে না, সেহেতু ইবলিশের মুখ ওদের সামনে বিভিন্ন আকৃতিতে রূপান্তরিত হতে থাকে। ওরা দেখতে পায় অকস্মাৎ দাঁড়িয়ে পড়া সৈনিক তিনজন দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন আলোচনা করছে। ওরা বুঝে যায় ভাষা কোনো ব্যাপার নয়, সৈনিকরা কী করবে তা ওদের কাছে স্পষ্ট। ওরা দু'বোন হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। নিস্তব্ধ চরাচরে এমন আকস্মিক শব্দে চমকে ওঠে তিনজন সৈনিক।

বিকৃত কণ্ঠে বলে, রোঁতা কিঁউ?

মুয়াজ্জিন আল-আমিন কতক্ষণ উঠোনে পড়েছিল মনে করতে পারে না। দু'বার মাথা তোলার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ধরে রাখতে পারেনি। সঙ্গে সঙ্গে সে মাথা আবার লুটিয়ে পড়ে গেছে। হাত বাড়িয়ে সংজ্ঞাহীন জোহরা বিবিকে পেয়েছে। চিৎ হয়ে শুয়ে থেকে আবার চোখ খুললে আল-আমিনের চোখের সামনে ভরদুপুর মুছে গিয়ে জ্যোৎস্না প্লাবিত রাত্রি জেগে ওঠে এবং একই সঙ্গে রূপবতী যমজকন্যা দুটির জন্মের সময়টা মনে করতে পারে। ও মেয়েদের জন্মের তারিখ, বার, সময় এবং বৎসর যত্ন করে একটি কাগজে লিখে বাঁধিয়ে রেখেছে। মেয়েদের বয়স বাঁধিয়ে রাখার ব্যাপারটি জোহরা বিবির পছন্দ হয়নি। কারণ যত বয়স হবে ততই তো বয়স কমাতে হবে। বাঁধিয়ে রেখে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে লাভ কী? মুয়াজ্জিন আবেগে গদগদ হয়ে বলে, কেন বাঁধিয়ে রেখেছি সে তুমি বুঝবে না। মেয়ে দু'টি যখন জন্মালো তখন অলৌকিক আলো খেলা করেছিল আমার ঘরের চালে। আহা কী সুন্দর, কী রূপবতী আলো।

মুয়াজ্জিনের চোখ বুঁজে যায়, কথা বলতে বলতে গলার স্বর খাদে নেমে আসে। স্বামীর এই অবস্থা দেখলে জোহরা বিবির ভয় করে। লোকটা পাগল না তো? না তা হতে পারে না, আল-আমিন ঈমানদার মুসলমান। নামাজ কাজা করে না, রোযা রাখতে ভুল হয় না। তাহাজ্জদের নাময পড়ে। এত কিছুর পর তো একটি লোক পাগল হতে পারে না। কিন্তু তারপরও জোহারা বিবিকে মুয়াজ্জিন স্বামীর একটি গল্প শুনতে হয়। আমিনা ও মদিনা জন্মের সময়ের গল্প। লোকটি তখন কেমন যে করে। জোহরা বিবির বুক ধড়ফড় করে। মনে হয় পরহেজগার স্বামী মুয়াজ্জিনের কণ্ঠ সেটা নয়। তবু শুনতে হয় সে কণ্ঠ।

ঘরের ভেতর সেদিন তুমি প্রসব বেদনায় কাতরাচ্ছিলে, আমি উঠোনে বসে সে গোঙানি শুনে ভাবছিলাম বুঝি চৌচির হয়ে যায় মাটি। ঘরের দরজা আগলে বসেছিল দাই বুড়ি। হাত-পা ছড়িয়ে পিঠটা হেলান দিয়ে বসে থাকে। যেন কোথাও কোনো শব্দ নেই কিংবা প্রবল শব্দ থাকলেও তার কিছু আসে যায় না। ওর অপেক্ষা শুধু শিশুর ক্রন্দনের জন্য। আমার অন্ধ মা দাওয়ায় বসেছিল− তোর ঘরের চালে চাঁদ উঠেছে নাকি আল-আমিন? আমি দৌড়ে মায়ের কাছে আসি। মা দেখতে পায় না কিন্তু মায়ের চোখে আলো ভর করেছে। এই আনন্দে আমার বাঁশি বাজাতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু শরমে পারিনি। মুয়াজ্জিন হয়ে বাঁশি বাজালে লোকে যদি− এইটুকু বলে লাজুক হাসে মুয়াজ্জিন। ওর নূরানি চেহারায় নূর খেলে যায়। জোহরা বিবি সে সময় মনে মনে বলে− আহা কী অপরূপ দৃশ্য। কিন্তু সামনাসামনি বলে− বাজালেই পারতেন, না বাজিয়ে ঠিক করেননি।

বাজাইনি ভয়ে। বাঁশি বাজালে গাঁয়ের লোকে যদি মসজিদে ঢুকতে না দেয়, সেজন্য আমি নিজের ইচ্ছার কাছে নিজেই জবাই হয়ে গেছি বিবি।

আপনি তো ছোটবেলায় বাঁশি শিখতে চেয়েছিলেন।

চুপ চুপ, এ কথা কাউকে বলবে না, সেদিন ঘরের চালে আলো দেখে আমি উঠোনে ছুটাছুটি করে দোয়া-দরূদ পড়েছিলাম। শেষ রাতের দিকে তোমার কাতরানি বন্ধ হয়ে গেল। শুনতে পেলাম শিশুর কান্না। আমার মা হাসতে হাসতে বলল, মনে হয় তোর দু'টি সন্তান হয়েছে আল-আমিন।

আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম। আল্লাহর কাছে শোকর-গোজারি করে ভাবলাম মা এসব বলে কী!

ও মা আপনি পাগল হলেন?

পাগল হইনি রে বাবা, দাই বুড়ি খবর নিয়ে এল বলে।

আমি তো নিজেকে ধরে রাখতে পারি না। ঘরের দরজার কাছে ছুটে গিয়ে দাই বুড়িকে ডাকি। বুড়ি চেঁচিয়ে বলে, চাঁদের মতন দুইডা মাইয়া অইছে তুমার।

আমি মায়ের পা ধরে সালাম করি, মা আপনার কথাই ঠিক। ওদের নাম রাখলাম আমিনা আর মদিনা। মা হেসে বলল, বড় পবিত্র নাম। পরদিন দুই নাতনির গা ছুঁয়ে তরতাজা স্বাস্থ্য নিয়ে মরে গেল আমার মা।

এই পর্যায়ে মুয়াজ্জিনের কণ্ঠ ধরে আসে। কিন্তু সে সারা জীবনে সেই অলৌকিক আলোর কথা ভুলতে পারেনি। তবে মানুষটাকে নিয়ে ঘর করে জোহরা বিবি সুখে আছে। দুই রূপবতী কন্যা জন্ম দিয়ে জোহরা বিবি আর সন্তান ধারণ করেনি। মনে মনে একটি ছেলের আকাঙ্ক্ষা থাকলেও মুয়াজ্জিনের আক্ষেপ নেই। আল্লাহ্ তাকে যা দিয়েছে তা নিয়েই সে খুশি।

ছোটবেলা থেকেই আপন মনে সুখী হতে শিখেছে মুয়াজ্জিন। শৈশবে ও গাঁয়ের বয়াতির গান শুনে গলা ছেড়ে গান গাইতে শিখেছিল। বাবা একদিন কষে ধমক লাগালেন। বললেন, হারামজাদা মুসলমানের ছেলে গান গায়? আর যেন কখনো গান গাইতে না দেখি।

আল-আমিন মুহূর্ত দেরি না করে বাপের নির্দেশ পালন করে। ছেলে বিপথে যাবে ভেবে বাপ ওকে মাদরাসায় ভর্তি করে দেয়। মাদরাসা বন্ধ থাকলে ও লুকিয়ে লুকিয়ে পাশের গাঁয়ের আশীষ মণ্ডলের কাছে বাঁশি শিখত। আশীষ বলত, বড় মিষ্টি তোর সুর। তোকে দিয়ে হবে রে আল-আমিন, তুই বড় শিল্পী হবি।

কিছুদিন পর বাপে টের পেয়ে এমন মার দিল যে, দু'দিন জ্ঞান ফিরল না। মায়ের কান্নাকাটিতে বাড়িতে ডাক্তার এল, সুস্থ হয়ে মাদরাসায় ফিরে গেল ও। বাপ বললেন, হুজুর ছেলেটার কুপথের দিকে নজর, আপনি ওকে মানুষ করুন। ওকে মানুষ করার জন্য হুজুরের কষ্ট করতে হয়নি। ও নিজে নিজেই সুখী হতে জানে। এমন মন দিয়ে পড়ালেখা করে যে বাঁশির কথা ভুলেও মনে হয় না। যখন কুরআন তেলাওয়াত করে তখন মুগ্ধ হয়ে শোনে মাদরাসার শিক্ষক ও ছাত্ররা। সবাই একবাক্যে স্বীকার করে এই মাদরাসা থেকে পঁচিশ বছরে যত ছেলে বেরিয়েছে আল-আমিনের মতো কেউ না। আল-আমিন মনে মনে

খুশি, ভাবে, আমপারার সুরের মধ্যেই বাঁশি আছে। সুর যেখান থেকেই উঠুক না কেন, মানুষের মনটাই সত্যি। মন ঠিক থাকলে সবকিছু থেকেই সুর ওঠে। ওর কোনো আক্ষেপ নেই, দুঃখ নেই। হুজুর যা তালিম দেয় তা মনপ্রাণ ঢেলে শেখে। হুজুর বলেন, তোকে আমরা মুয়াজ্জিন বানাবো। তোর আযান শুনে মানুষ মসজিদে ছুটে আসবে নামায পড়তে।

আল-আমিন মাথা নেড়ে সায় দেয়। সেই থেকে কত বছর পেরিয়ে গেছে তার হিসেব ওর আর মনে নেই, চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা মুয়াজ্জিনের দৃষ্টি আকাশের দিকে স্থির হয়ে থাকে। ও আঁতিপাঁতি খুঁজতে থাকে মেয়েদের জন্মের সময় ফুটে থাকা সেই অলৌকিক আলো।

এক সময় মুয়াজ্জিনের দৃষ্টি নেতিয়ে পড়ে।

কিন্তু নেতিয়ে পড়ে না আমিনা ও মদিনার দৃষ্টি। প্রচণ্ড ব্যাথায় দুমড়ে যাচ্ছে শরীর। শরীরের জায়গায় জায়গায় শুকনো ঘাস এবং ধুলো লেগে নকশি কাঁথায় তোলা ফুলের মতো কিছু একটা হয়েছে। কেমন অদ্ভুত হয়ে গেছে নিজেদের শরীর। সৈনিক তিনজন ওদের হাত ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে দেয়। একজন আঙুল উঁচিয়ে খেঁকিয়ে বরে, কলেমা জানতা?

দু'বোন মাথা নাড়ে।

পড়।

দু'বোন গড়গিড়িয়ে বলে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।

সাবাস।

ওরা উল্লাসে আকাশের দিকে গুলি ছোঁড়ে। আমিনা ও মদিনা পলকহীন দৃষ্টিতে তিনজন সৈনিকের মুখে আনন্দ দেখতে পায়। ওরা জোরে জোরে কলমা পড়তে থাকে– ওরা ভুলে যায় ওদের রক্তক্ষরণের কথা এবং ভুলে যায় অজুবিহীন অবস্থার কথা। ওদের পরহেজগার পিতা কত যত্নে ওদের কত কিছু যে শিখিয়েছিল। ওরা মনেপ্রাণে সেসব কিছু আঁকড়ে ধরে। ওরা কোনো কিছু ভুলতে চায় না। এক সময় ওরা দেখতে পায় ওরা হাঁটতে পারছে না, ওদের হাঁটু ভেঙে যাচ্ছে তখন তিনজন সৈনিক ওদের পিঠে করে ক্যাম্পে নিয়ে আসে। বহুত খুব সুরত লাড়কি, বলতে বলতে হর্ষধ্বনিতে মেতে ওঠে অন্য সৈনিকেরা।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

অলৌকিক– মানুষের পক্ষে অসম্ভব, লোকাতীত, ইহলোকের নয় এমন। **আনমনা–** অন্যমনস্ক, অমনোযোগী, **ঈমান–** বিশ্বাস। **ঘূর্ণন–** ক্রমাগত ঘোরা, আবর্তন। **জড়সড়ভাবে–** ভীত ও আড়ষ্টভাবে, সংকুচিতভাবে। **জোহর–** সূর্য পশ্চিম আকাশে ঈষৎ ঢলে পড়লে যে নামাজের সময় হয়। **অলৌকিক–** মানুষের পক্ষে অসম্ভব, লোকাতীত, ইহলোকের নয় এমন।

সারসংক্ষেপ

মুয়াজ্জিন আল-আমিন পরহেজগার মানুষ। তার দুই কন্যা- আমিনা ও মদিনা। মেয়েদের তিনি শৈশব থেকে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী মুয়াজ্জিনের বাড়িতে গিয়ে আমিনা ও মদিনাকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায়। মুয়াজ্জিন আল-আমিন অনেক চেষ্টা করেও মেয়েদের মুক্ত করতে পারেননি। বন্দি দুই বোন মানসিকভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ে। ক্যাম্পে সুন্দরী দুই নারীকে পেয়ে পাকিস্তানি সৈন্যরা উল্লাসে মেতে ওঠে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন কে?

ক. ইমাম | ক. মুয়াজ্জিন
গ. ইউনিয়নের চেয়ারম্যান | ঘ. সুদর্শন পুরুষ

২. 'হুজুর ছেলেটার কুপথের দিকে নজর' এখানে 'কুপথ' বলতে বোঝানো হয়েছে–

ক. বাঁশি বাজানো | খ. পরপুরুষের কণ্ঠ
গ. গল্প শোনা | ঘ. নৃত্য করা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

'তুমি বলেছ, তুমি আমাদের দোস্ত আদমী আছ, তবে এখন দোস্তের কাম কর। এই আওরাত তিনটাকে আমাদের দরকার। আমরা নিয়ে যাব। লেকিন কুচ ঘাবড়াও মাৎ, তিন দিন বাদে রেখে যাব।' এতোটা সহ্য করার ক্ষমতা মালেক সাহেবের ছিল না। তিনি আর্তনাদ করে উঠলেন।

৩. উদ্দীপকের মালেক সাহেবের সঙ্গে 'আমিনা ও মদিনার গল্প'-এর কোন চরিত্রের মিল রয়েছে?

ক. আল-আমিন　　　　খ. চেয়ারম্যান

গ. মসজিদের ইমাম　　　　গ. কমান্ডার

৪. উদ্দীপক এবং 'আমিনা ও মদিনার গল্প'-এ প্রকাশ পেয়েছে–

ক. ধর্মের অপব্যবহার　　　　খ. ধর্মীয় অনুভূতি

গ. ধর্মে অনাস্থা　　　　ঘ. ধর্ম পালনে অনীহা

পাঠ-২

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- মুয়াজ্জিন আল-আমিনের পরিণতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আমিনা ও মদিনার পরিণতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- ছোটগল্প হিসেবে আলোচ্য রচনাটির সার্থকতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

মুয়াজ্জিন আল-আমিন কিভাবে ইমামের কাছে ছুটে এসে তার পা জড়িয়ে ধরেছে বলতে পারে না। তার বুকফাটা আর্তনাদ তীব্র হয়ে ওঠে দু'টো শব্দে।

হুজুর–আমার–।

খামোস। অধৈর্য হবেন না। আমি সব শুনেছি। এসব ঈমানের পরীক্ষা। হুজুর।

আপনি ধর্মের দোহাই দেবেন না। এই দেশে এখন ইসলাম বিপন্ন। এটা রক্ষা করা সবার দায়িত্ব। আপনি তো শুধু মেয়ে দিয়েছেন। এরপর জীবনও দিতে হবে। যান, বাড়ি যান।

মুয়াজ্জিন বাড়ি ফিরতে পারে না। ঈমাম ওকে আঙুল তুলে শাসিয়ে দিয়েছে। সাদা চুল-দাড়িতে ভরা এত দিনকার মানুষটি, যাকে ও নূরানী চেহারার মানুষ বলে চিনত, ওর কাছে খাটাসে রূপান্তরিত হল– মুয়াজ্জিন এই প্রথম রাজনীতিতে ধর্মের এমন বিকৃত ব্যবহার উপলব্ধি করে অসহায়ভাবে কাঁদতে থাকে।

ওকে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে দেখে কোনো কোনো নিরীহ মানুষ এগিয়ে এসে ওর হাত চেপে ধরে।

কাঁইদেন না হুজুর। কাঁইদেন না। দেইখবেন দুশমনদের উপর আল্লাহ্‌র গজব পড়ব। আল্লাহ এই অন্যায়ের বিচার করব। আর একজন বলে, চলেন চেয়ারম্যানের কাছে যাই। কমান্ডারের লগে চেয়ারম্যানের খাতির আছে। কামান্ডার ইচ্ছা করলে আপনার মাইয়াগোরে ফিরত পাডাইতে পারে।

সবাই মিলে শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানের কাছে যায়। তিনি মৃদু হেসে শান্ত স্বরে বলেন, পঁয়ত্রিশ বছর ধরে আমি এই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। এমন দুর্যোগ আর দেখি নাই। আমাদের সবার উচিত ঝাঁপিয়ে পড়ে এই দুর্যোগের মোকাবিলা করা।

বাবা ঘরে যাও। আল্লাহর কাছে শোকর কর। তোমার মেয়েরা পাকিস্তান রক্ষা করছে।

মুয়াজ্জিনের কণ্ঠ দিয়ে শব্দ বের হতে কষ্ট হয়। তবু কাঁদতে কাঁদতে বলে, আমার মেয়েদের ইজ্জত–

ইজ্জত দিয়ে কী হবে বাবা? আগে ধর্ম, আগে দেশ।

এটা কেমন ধর্ম?

চেয়ারম্যান কথা বাড়াতে দেয় না। ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয় মুয়াজ্জিনকে। কড়া গলায় বলে, এত চিন্তা কিসের। মেয়েরা গেলে আরো মেয়ে হবে।

হুজুর দুই যমজ মেয়ের পর আমার বিবির আর সন্তান হয়নি।

চেয়ারম্যানের কণ্ঠ তরল হয়ে যায়। হাসতে হাসতে বলে, আবার নিকাহ করবে। দুসরা বিবি হবে। খুব সুরত লাড়কি হবে।

মুয়াজ্জিন আল-আমিন কোনো কথা না বলে ক্ষিপ্রগতিতে আর একটি খাটাসের সামনে থেকে চলে আসে। ও বুঝতে পারে ওর মাথার ভেতর অলৌকিক আলোর ঘূর্ণি উঠেছে। মুয়াজ্জিন পাগলের মতো মাঠের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে দু'হাত ওপরে তুলে নৃত্য করতে থাকে। ওর সঙ্গী, গ্রামের সরল লোকেরা এ দৃশ্য দেখে কেঁদে ফেলে। ওরা অনেক কষ্টে মুয়াজ্জিনকে বাড়িতে নিয়ে আসে।

পরদিন সকালবেলা দেখা যায়, মুয়াজ্জিন আল-আমিন লোক চিনতে পারছে না। জোহরা বিবি হায় হায় করে বারান্দার ওপর আছড়ে পড়ে।

মিলিটারির জিপে চড়ে আমিনা ও মদিনা ক্যাম্প থেকে কোনো এক বাংকারে যেতে থাকে। দু'বোনে দু'চোখে মেলে দেশটাকে দেখে। এভাবে তো জিপে করে বড় সড়ক দিয়ে ওরা কোথাও যায়নি, যেখানে দৃশ্যগুলো গাড়ির গতির সঙ্গে ছুটতে থাকে। গাড়ির ছোটার সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে আসে বিপরীতমুখী বাতাস– কেমন এক আশ্চর্য স্পর্শ, ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলে বুক– ভার করে দেয়, উজাড় করে দেয়, স্তব্ধ করে দেয়। দু'জন দু'জনের হাত চেপে ধরে। কথা বলে না, যেন উভয়ের শোণিতে প্রবাহিত হয় এক বিরল ভাবনা। যৌবনের সন্ধিক্ষণে সব তছনছ হয়ে যাওয়ার মুহূর্তগুলো ফিরে পাওয়ার হাহাকার। কার জন্য এমন করে সর্বস্ব দিতে হল ওদের? কিন্তু বেশিক্ষণ ওরা নিজের ভেতর থাকতে পারে না। বেরিয়ে আসতে হয়। কেননা কিছুক্ষণ পরপর দৃশ্যগুলো অন্যরকম হয়। পথের বাঁক বদলে যায়। বিশাল গাছগুলো অদ্ভুত আকারে দাঁড়িয়ে থাকে, কোথাও বাশের ঝাঁড়ের একটা ভঙ্গি ফুটে থাকে, কোথাও ক্ষেতের আল দিয়ে হেঁটে যাওয়া মানুষের শরীর বিচ্ছুরিত হতে থাকে, আলু ক্ষেতে উপুড় হয়ে বসে থাকা মানুষের ঘাড় নুয়ে গেলে সেটা মসজিদের চূড়ার মতো গোলাকার হয়ে যায়– পুরো আকাশটা কেমন নুয়ে থাকে, ওটা আর ঘন নীল নয়– ধূসর কালচে এবং পিতাজানের সুললিত কণ্ঠের মতো আচ্ছন্ন করে দেওয়া রঙ গাড়ির গতির সঙ্গে ছুটতে ছুটতে উধাও হয়ে যায়। কী সুন্দর, কী সুন্দর! দু'বোনের অন্তর হাহাকার করে ওঠে। পিতাজান বলেছেন, এই দেশটাকে শেখ মুজিব ভারতের কাছে বিক্রি করতে চায়। এজন্য পাকিস্তান আর্মি মরণপণ লড়াই করছে। কিন্তু পিতাজান এটাও তো বলেছিলেন যে, ওরা সাচ্চা মুসলমান। আমরাও মুসলমান। ওরা কোনো গুনাহর কাজ করবে না। কিন্তু এখন? দু'বোন আঁচলে চোখ ঢাকে। কাঁদতে কাঁদতে চোখের পাতা ফুলে যায়। একজন আমিনার গায়ে ঠোনা মেরে বলে, রোঁতা কিউ? মাত রঁও।

দু'বোন চুপ করে থাকে। ওরা কিছু বোঝে না। ওরা ভেবে পায় না যে, কেন বুঝতে পারে না। মুসলমানের ভাষা তো ওদের বোঝা উচিত। দু'জনেরই মনে হয় ছোটবেলা থেকে কিছু না বুঝে মুখস্থ করা আমপারার ভাষায় বুঝি ওরা কথা বলছে। পিতাজান যদি শুধু মুখস্থ না করিয়ে ভাষাটার মানে বুঝিয়ে দিতেন? তাহলে দু'বোন কী তীক্ষ্ণকণ্ঠে ওদের সঙ্গে ঝগড়া করত? পিতাজানের কাছ থেকে শোনা মুসলমানের বর্ণনার সঙ্গে এদেরকে কিছুতেই মেলাতে পারে না ওরা। বারবার ভেসে আসে সেই সুললিত কণ্ঠ, মনে রাখবে তোমরা মুসলমান। পবিত্র নাম রেখেছি তোমাদের। আমি চাই তোমরা তাপসী রাবেয়া হবে। দু'বোনের অন্তরাত্মা হাহাকার করে ওঠে, আব্বাজান আমাদের বলেছেন তাপসী রাবেয়া হতে কিন্তু কেমন করে তাপসী রাবেয়া হব আমরা? আমরা তো আর কখনো আমাদের পূর্ব জীবন ফিরে পাব না। ওরা নাপাক শরীরে প্রাণ খুলে দরূদ পড়তে পারে না। বাংকারের অন্ধকারে দু'বোন মানসিক শক্তির জন্য কোনোকিছু স্মরণ করতে চাইলে অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো ওদের সামনে ভেসে ওঠে। ঘুমের মধ্যে কঁকিয়ে ওঠে মদিনা, আমরা এমন মেয়ে হতে চাইনি। আমরা পবিত্র কুরআনের আয়াত প্রাণভরে মুখস্থ করে যেতে চাই।

দু'জনে দু'জনের পিঠে হাত বুলোলে টের পেয়েছিল, মসৃণ পিঠ অমসৃণ হয়ে গেছে। অসংখ্য ছোট বড় ক্ষতের চিহ্ন। আমিনা কণ্ঠের একই ভঙ্গি বজায় রেখে বলেছিল, আমাদের শরীরটা আর আমাদের নেই। হি-হি করে হেসে উঠেছিল মদিনা। হাসতে হাসতে বলে, আমরা যে পাকিস্তান রক্ষা করছি।

আমিনা বলতে পারেনি, চুপ হাসিস না। আব্বাজান শুনতে পাবেন।

বাংকারের ভেতর দু'বোন এভাবে ওদের আব্বাজানকে কষ্ট থেকে দূরে রাখতে চেয়েছে। কতদিন, কত মাস গড়িয়েছে ওরা জানে না। নাকি বছর পেরিয়ে গেল?

বোশেখ মাসের কথা ওদের খুব মনে আছে, এখন কার্তিক হতে পারে। হালকা শীত পড়ছে। দু'দিন ধরে সৈনিকগুলো উদ্বিগ্ন। সারাক্ষণ কী জানি বলাবলি করে। বাংকারে পাহারা জোরদার হয়েছে। দু'বোন ফিসফিসিয়ে বলে, লড়াই কি শুরু হয়ে গেল?

মদিনার শুকনো মুখে আর্তনাদ, আমরা কি এই গর্তের ভেতর মরে যাব? আব্বা আম্মার সঙ্গে দেখা হবে না?

বেঁচেও তো যেতে পারি। যুদ্ধে এই শয়তানগুলো সব খতম হবে। ঠিক বলেছিস, মুক্তিযোদ্ধারা এসে আমাদের উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। ওরা তো আমাদের দেশের মানুষ।

দু'দিন পর প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দে ঘুম ভেঙে যায় দু'বোনের। সৈনিকরা চেঁচামেচি করে, লড়াই শুরু হো গিয়া। মুকুত আ গিয়া।

পাথরের চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকে ওরা। গাঁয়ের মেয়েদের মুখে স্বাধীনতার কথা শুনছে। ওরা জানে না স্বাধীনতা কী, আব্বাজান ওদের বুঝিয়ে দেননি। কিন্তু নিজেদের দিকে তাকিয়ে ওরা স্বাধীনতার একটা অর্থ দাঁড় করাতে চায়। একজন মদিনার চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, বাঙালি গাদ্দার। শুয়ারকা বাচ্চা। সে মুহূর্তে আমিনার দাঁতে ঘর্ষণ হলে কিড়মিড় শব্দ ওঠে।

অনেক রাতে দু'বোন বুঝতে পারে গোলাগুলির শব্দ প্রবল হয়ে উঠেছে। মুক্তিযোদ্ধারা কি বীরদর্পে এগিয়ে আসছে? আনন্দে দু'বোনের চোখ চিকচিক করে ওঠে। ওরা বাংকারের কোনায় দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে। শব্দের ভেতরও ওদের ঘুম আসছে। এত দিনে আজ ওরা পরিপূর্ণ বিশ্রাম পেয়েছে। ওরা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। অল্পক্ষণে দু'জনে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হলে ফেলে আসা ভরদুপুরের মেঠোপথ দেখতে পায়। ওদের পিতার মুখে অসংখ্যবার শুনেছে ওদের জন্মের সময়ে ঘরের চালে অলৌকিক আলো দেখা গিয়েছিল। সে আলো ভর করেছিল ওদের অন্ধ দাদির চোখে। সেই একই আলো ফুটে উঠতে থাকে। কোথাও কেউ নেই। শুধু একজন মানুষ সোনালি চাদর গায়ে দিয়ে সেই পথ ধরে এগিয়ে আসছে। দু'বোন উদগ্রীব হয়ে থাকে, কে তিনি? ওরা দেখতে পায় মানুষটির হাতে রাইফেল– সেটা কখনো চাদরের নিচে চলে যায়, কখনো চাদরের আড়াল থেকে নলটা বেরিয়ে এসে তাক করে শূন্যে। ছুটে যায় গুলি। দু'বোন বাংকারের দরজায় মাথা তোলে। তিনি এগিয়ে আসেন। বলেন, বেরিয়ে আসুন। ওরা লজ্জা পায়। দু'হাতে নিজেদের শরীর ঢাকে। সেই যোদ্ধা মানুষটি সোনালি চাদর খুলে ওদের দিকে বাড়িয়ে দেন। বলেন, চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিন। আপনাদের কোনো লজ্জা নেই, সব লজ্জা আমাদের। আসুন, বেরিয়ে আসুন। দেখুন চারদিকে কেমন অপূর্ব আলো।

একই সঙ্গে দু'বোনের ঘুম ভেঙ্গে যায়।

পরস্পরের দিকে তাকায়। আমিনা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, আমি একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি মদিনা।

আমিও দেখেছি। মদিনার কণ্ঠ উচ্ছ্বাসে খান খান হয়ে যায়।

দু'বোন জেগে থেকেও স্বপ্নের ভেতর ডুবে যায়।

সুপুরুষ এক যোদ্ধা ওদের করোটির ঘন কুয়াশার ভেতর দিয়ে হেঁটে আসছে সব লজ্জা আড়াল করে দেওয়ার জন্য। দু'বোনের শরীরে অদ্ভুত শিহরণ– এমন আনন্দ ওদের ষোল বছরের জীবনে এই প্রথম।

আমিনার হাত জড়িয়ে ধরে মদিনা বলে, আমি এমন মানুষকে ভালবাসতে চাই।

আমিনা অপলক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বরে, আমিও।

বাইরের প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ ওদের শিহরিত করে।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

আর্তনাদ– ক্রন্দন, কাতর, চিৎকার। **ইজ্জত–** মান, সম্মান, সতীত্ব, সম্ভ্রম। **ইমাম–** যিনি নামাজে নেতৃত্ব দেন, যার পিছনে দাঁড়িয়ে জামাতে নামাজ পড়া হয়। **করোটি–** মাথার খুলি। **দুশমন–** শত্রু। **নাপাক–** অপবিত্র। **মাত রও–** চুপ থাক, কোনো কথা নাই। **রোঁতা কিউ–** কাঁদ কেন? **শিহরিত–** রোমাঞ্চিত। **সুললিত–** অতিশয় সুন্দর, মনোহর ।

সারসংক্ষেপ

আমিনা ও মদিনাকে উদ্ধার করার জন্য মুয়াজ্জিন আল আমিন সমাজের গণ্য-মান্য অনেকের কাছে যায়। কিন্তু কেউই তাকে সাহায্য করে না। সবাই বলে পাকিস্তানি বাহিনী যা করেছে, সবই ধর্মের জন্য করেছে। আমিনা ও মদিনাকে এক ক্যাম্প থেকে অন্য ক্যাম্পে নিয়ে যায় পাকিস্তানি সৈন্যরা। দুই বোন অসহায়ভাবে দিন কাটাতে থাকে। অবশেষে একদিন মুক্তিযোদ্ধারা পাক-বাহিনীকে পরাজিত করে আমিনা ও মদিনাকে উদ্ধার করে ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫. মসজিদের ইমাম আল- আমিনের নিকট কিসে রূপান্তরিত হয়?

ক. কমান্ডার   খ. খাটাস

গ. সৈনিক   ঘ. মিলিটারি

৬. পরদিন সকালবেলা আল-আমিনকে চেনা যাচ্ছিল না যে কারণে–

ক. পাগলের মতো আচরণ করায়   খ. চেহারায় নুর প্রতিফলিত হওয়ায়

গ. উপুড় হয়ে ঘাড় নুয়ে যাওয়ায়   ঘ. খাটাসে রূপান্তরিত হওয়ায়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

১৯৭১ সালের জুনের মধ্য সময়। পাকিস্তানিদের বাঙ্কারে অসহায় অবস্থায় পড়ে আছে দুই বান্ধবী – অবন্তী ও তৃষা। পাক সেনারা বাঙ্কারের বাইরে গেলে অবন্তী বলে উঠে, আমরা এমন মেয়ে হতে চাইনি। অবন্তীর কথা শুনে হাসি পায় তৃষার। বলে, আমাদের যে পাকিস্তানকে রক্ষা করতে হবে।

৭. উদ্দীপকের অবন্তীর সঙ্গে 'আমিনা ও মদিনার গল্প' রচনার কার সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. মদিনা   খ. আমিনা

গ. জোহরা   ঘ. রাবেয়া

৮. উদ্দীপক এবং 'আমিনা ও মদিনার গল্প' রচনায় প্রকাশ পেয়েছে–

i. ব্যঙ্গ

ii. ক্ষোভ

iii. কৃতজ্ঞতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i   খ. ii

গ. iii   ঘ. iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৯. চেয়ারম্যানের সঙ্গে কার খাতির রয়েছে?

ক. মুয়াজ্জিন   খ. ইমাম

গ. কমান্ডার   ঘ. সুদর্শন পুরুষ

১০. আল-আমিনকে মাদ্রাসায় ভর্তি করা হয়েছিল যে কারণে–

ক. কুপথে যাবে না　　খ. পাকিস্তানকে রক্ষা করবে
গ. শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান হবে　　ঘ. সাচ্চা সৈনিক হবে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

মুক্তির মন্দির সোপান তলে
কত প্রাণ হলো বলিদান, লেখা আছে অশ্রুজলে।
কত বিপ্লবী বন্ধুর রক্তে রাঙা, বন্দিশালার ওই শিকল ভাঙা
তাঁরা কি ফিরবে না আর?
তাঁরা কি ফিরবে এই সুপ্রভাতে–
যত তরুণ অরুণ গেছে অস্তাচলে।

১১. উদ্দীপকের তরুণদের সঙ্গে 'আমিনা ও মদিনার গল্প' রচনায় কাদের সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. আমিনা ও মদিনা　　খ. ইমাম ও মুয়াজ্জিন
গ. পাকিস্তানি সেনা　　ঘ. জোহরা ও রাবেয়া

১২. উদ্দীপক এবং 'আমিনা ও মদিনার গল্প' রচনায় প্রকাশিত হয়েছে–

ক. ভালোবাসার প্রত্যাশা　　খ. মুক্তি ও স্বাধীনতার স্বপ্ন
গ. সুদর্শন পুরুষের স্বপ্ন　　ঘ. আলোর আকাঙ্ক্ষা

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ :

ধুত্তোর বই। বই নিয়ে হবে টা কি শুনি। কাগজের বুকে হিবিজিবি আঁক কাটা যতো সব আবর্জনা। ওই আবর্জনায় হাত দিয়ে পাক-সৈন্যরা না-পাক হতে চায়নি। হাত যেখানে- সেখানেই দেওয়া যায় না কি। হাত দেওয়া যায় রোটি ও রাইফেলে। আর আওরাতের গায়ে। দুনিয়ার সেরা চিজ আওরাত, আওর রাইফেল। রোটি খেয়ে গায়ের তাকাত বাড়াও, রাইফেল ধরে প্রতিপক্ষকে খতম কর, তারপর আওরাত নিয়ে ফূর্তি কর। জীবন সম্পর্কে এই ধারণায় আমনের আস্থা নেই, কোনো বাঙালির নেই। আমন যতক্ষণ পারলেন প্রাণপণে প্রচণ্ড আর্ত-হাহাকারকে বহন করলেন। বিলাপ করে করে বেদনাকে ঝেড়ে ফেলতে চাইলেন।

ক. আল-আমিনের বাড়িতে কতজন পাকিস্তানি সেনা এসেছিল?
খ. ইমামকে কেন 'খাটাস' বলা হয়েছে?
গ. উদ্দীপকে কথিত 'আওরত' আপনার পঠিত গল্পে কাকে প্রতিনিধিত্ব করে? –আলোচনা করুন।
ঘ. "যুদ্ধ মানবজীবনে কল্যাণ নয়, বিপর্যয়কেই ডেকে আনে।" –উদ্দীপকের আমন এবং 'আমিনা ও মদিনার গল্প' রচনার আল-আমিন চরিত্রের আলোকে মন্তব্যটি বিচার করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন-১

ক.

মুয়াজ্জিন আল-আমিনের বাড়িতে তিনজন পাকিস্তানি সৈন্য এসেছিল।

খ.

মসজিদের ইমামকে আল-আমিনের নিকট খাটাস বলে মনে হয়েছে।

আল-আমিন নিজের দুই মেয়েকে রক্ষা করতে না পেরে মসজিদের ইমামের নিকট ছুটে আসে। সে তার দুই কন্যাকে উদ্ধার করার জন্য ইমামের পা জড়িয়ে ধরে। কিন্তু ইমাম সাহেব বলেন যে, এটা হচ্ছে ঈমানের পরীক্ষা। ইসলাম ধর্ম এখন বিপন্ন। তাই আগে ধর্মকে রক্ষা করতে হবে। আল আমিন জীবনে এই প্রথম রাজনীতিতে ধর্মের বিকৃত ব্যবহার উপলব্ধি করে। তাই তার নিকট মসজিদের ইমাম খাটাসে রূপান্তরিত হয়েছে।

গ.

উদ্দীপকে বর্ণিত আওরাত 'আমিনা ও মদিনার গল্প' রচনায় আমিনা ও মদিনাকে প্রতিনিধিত্ব করে।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাংলাদেশে এক মরণঘাতী যুদ্ধ শুরু করে। এর উদ্দেশ্য ছিল বাঙালি জাতির স্বাধীনতা স্পৃহাকে দমন করা। এ সময়ে পাকসেনারা নির্বিচারে হত্যা, গুম, লুট ও অগ্নিসংযোগ করে জনমনে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে। মুক্তিযুদ্ধের নয়মাস বাঙালি নারীদের উপর পাশবিক নির্যাতন এ যুদ্ধের একটি কলঙ্কময় দিক।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে দুনিয়ার সেরা চিজ আওরত। যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে খতম করে আওরত নিয়ে ফূর্তি করতে হবে। 'আমিনা ও মদিনার গল্প' রচনাটিতেও দেখা যায়, মুয়াজ্জিন আল-আমিনের দুই মেয়েকে পাকিস্তানি সেনারা তুলে নিয়ে যায়। একসময় তাদের আশ্রয় হয় পাকসেনাদের বাংকারে। শৈশবে দুইবোন তাপসী রাবেয়া হওয়ার স্বপ্ন দেখলেও শত্রু সেনারা তাদের শরীর নাপাক করে দেয়। মদিনার নিকট শ্লেষে মনে হয় যে এটি পাকিস্তান রক্ষা করার উপায়। অতএব, বলা যায় উদ্দীপকের চেতনা 'আমিনা ও মদিনার গল্প' রচনায় আমিনা ও মদিনা চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ.

উদ্দীপকের আমনের হাহাকার 'আমিনা ও মদিনার গল্প' রচনায় পিতা আল-আমিনের বিলাপে পরিণত হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাংলার জনগণের উপর নির্মম অত্যাচার চালিয়েছিল। তাদের হত্যা, ধর্ষণ ও লুটপাটে বাঙালির জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠে। একসময় এ যুদ্ধ জাতির জীবনে মানবিক বিপর্যয় ডেকে নিয়ে আসে। কালান্তরে এখানকার অধিবাসীরাও মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে শত্রু হননের শপথ গ্রহণ করে।

উদ্দীপকে যুদ্ধরত একদল সৈনিকের বিকৃত মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাদের মতে দুনিয়ার সেরা চিজ নারী। আমন এ মনোভাবকে মেনে নিতে পারেননি। সমকালীন যুদ্ধাবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তার হৃদয় আর্তহাহাকারে ভরে উঠে। তিনি বিলাপ করে তার মনোযন্ত্রণাকে ঝেড়ে ফেলতে চেয়েছেন। অন্যদিকে 'আমিনা ও মদিনার গল্প' রচনায় দেখা যায়, মুয়াজ্জিন আল-আমিন ঈমানদার মুসলমান হয়েও যুদ্ধরত সৈনিকদের নিকট হতে তার দুই মেয়ে আমিনা ও মদিনাকে রক্ষা করতে পারে না। সে পাগলের মতো মাঠের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে দু'হাত উপরে তুলে নৃত্য করতে থাকে। তাকে অনেক কষ্টে বাড়ি আনা হয়। কিন্তু পরদিন সকালবেলায় উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আল-আমিনের স্মৃতিবিভ্রম ঘটে, সে আর লোক চিনতে পারে না। উদ্দীপকে আমন এবং 'আমিনা ও মদিনার গল্প' রচনায় আল- আমিনের হৃদয়ে যুদ্ধ গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে। যুদ্ধ তাদের জীবনের স্বাভাবিক গতিধারাকে পাল্টে দিয়েছিল। উপরন্তু রাজনীতিতে ধর্ম ও মানবতার অপমানকে তারা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। বস্তুত যুদ্ধের নৃশংসতা আলোচ্য দুই চরিত্রের জীবনে মানবিক বিপর্যয় ডেকে এনেছিল।

অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

স্কুল ঘর জনপ্রাণীশূন্য। দেয়ালে টাঙ্গানো ব্ল্যাকবোর্ডে খড়ি মাটিতে কষা একটা অর্ধসমাপ্ত অঙ্ক ছাড়া কিছু চোখে পড়ে না। চার চারটা দরজা এবং সবগুলো জানালা খোলা। হরিমতি, সুমতি ঢুকে দম নেয়ার আগেই খান সেনাদের বুটের দাপট শুনতে পায়। ওরাও কিছুক্ষণ দম নেয়। চারিদিকে প্রাচীর। সশস্ত্র শিকারি এবং শিকার দুইটাই ভেতরে। কিছুক্ষণ মা মেয়ের আর্তনাদ ওঠে। পরে নিঃশব্দ হয়ে যায় স্কুল ঘর। হরিমতি সুমতিকে ওরা হত্যা করে না। রক্তাক্ত অজ্ঞান অবস্থায় ফেলে খান সেনারা রাইফেল কাঁধে স্কুল ঘর ত্যাগ করে।

ক. বিপদের সময় কি পড়তে হয়?

খ. 'ও মা, আপনি পাগল হলেন?' –উক্তিটি বুঝিয়ে বলুন।

গ. উদ্দীপকের হরিমতি ও সুমতি'র সঙ্গে 'আমিনা ও মদিনার গল্প' রচনার কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে? –আলোচনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপক এবং 'আমিনা ও মদিনার গল্প' রচনায় নারী চরিত্রগুলো যুদ্ধকালীন সময়ে একইরকম নির্মমতার শিকার।" –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গ ২. ক ৩. ক ৪. ক ৫. খ ৬. ক ৭. ক ৮. ক ৯. গ ১০. ক ১১. ক ১২. খ